বাঁচার জন্য নির্বাচিত

কবিতা সিংহ

বাঁচার জন্য নির্বাচিত
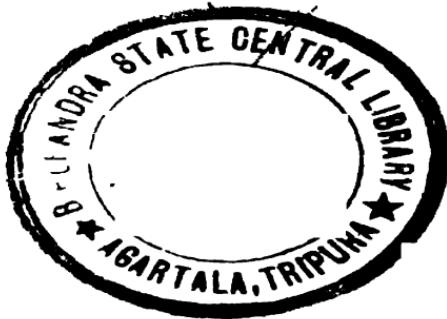
ন ব প ত্র প্র কা শ ন

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ও মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

রানী জেগেই শুয়ে ছিল কেবিনে। স্টীম লঞ্চটা একটা তীব্র বাঁশি বাজিয়ে প্রথম ঝাঁকানি দিল। ঝাঁকানি দিল, অর্থাৎ জেটি থেকে আলাদা হয়ে একেবারেই জলের হয়ে গেল। এবং রানী ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারল এবার বাঁধন ছিঁড়ল।

কিসের বাঁধন? জীবনের?

হঠাৎ অনেক বছর পরে এই গম্ভীর সিরিয়াস রানীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো আর একটা রানী। সেই লজ্জাহীন অনাথ মেয়েটা, যে হোস্টেলের শুকনো নিরানন্দ আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠতে উঠতে অকারণে খিলখিল করে হাসতো। সেই চোদ্দ বছর থেকে এই একুশে রানী এখন অনেক জেনে গেছে। সে জেনে গেছে, মাঝে মাঝে মৃত্যুটাও একটা হাসির জিনিস হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ সে দেখেছে। তাদের স্কুলের নতুন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মিস্ট্রেস হাসতে হাসতেই রাতে বিছানায় শুতে গিয়েছিল। সকাল বেলা যখন কব্জির শিরা কাটা অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় কি আশ্চর্য তখনো তার লাল্‌চে ফুল্ল ঠোঁটে এক ফোঁটা তাচ্ছিল্যের হাসি আটকে ছিল।

হ্যাঁ রানী দেখেছিল।

আজ সকালেও যখন স্টেশন ওয়াগনে রওনা হল ওরা, এই লঞ্চের মালিক সোমেশ্বর রায়চৌধুরী নূপুরদিকে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'জানো নূপুর ভাই, তোমার বৌদি বলে আমার 'রাজেন্দ্রাণী' নাকি

নোয়ার আর্ক। কত মানুষই যে 'রাজেন্দ্রাণী' চড়ে বেড়িয়েছে, বেড়িয়ে খুশি হয়েছে তার ঠিক নেই।'

সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর ঈষৎ স্থূলকায়া আহ্লাদী গিন্নী মালতী বৌদি ঘাড় ফিরিয়ে বলেছিল, 'তা আর নয়। কত বড় বড় পার্টি, কত হনিমুন যে আমাদের 'রাজেন্দ্রাণী'তে হয়েছে—আমি তো বলি সুখের জাহাজ। সত্যি 'রাজেন্দ্রাণী'তে চড়ে উনি আর আমি যখন বহুদূর ঘুরতে বেরোই তখন জলের রাজ্যে গিয়ে মনে হয় সত্যি কোথাও বুঝি আর কিছু নেই। তীর নেই, পার নেই। মানুষ জন নেই। বাঁচার জন্যে যা কিছু আছে, সব 'রাজেন্দ্রাণী'তে।

আসলে এই সব কথা মনে পড়ছে বলেই রানীর হাসি পাচ্ছে। সমস্ত সৃষ্টিকে মহাপ্রলয়ে ডুবিয়ে দেবার আগে ঈশ্বর নাকি নোয়াকে 'আর্ক' বানাতে বলেছিলেন। তাতে যারা নতুন ত্রুটিহীন ভুবনের সামিল হবে কেবল তারাই থাকবে জোড়ায় জোড়ায়। সোমেশ্বর রায়চৌধুরী যখন কাল কিংবা পরশু জানতে পারবে যে তার প্রমোদ-তরণীতে রানী স্মাগ্‌ল করে মৃত্যুকে নিয়ে এসেছিল তখন লোকটার গর্বিত তেজী চোয়ালটা ঠিক কতখানি ঝুলে পড়বে এ কথা জানবার জন্য রানী কিন্তু মৃত্যুর পরেও একবার এক পলকের জন্যেও বেঁচে উঠতে পারে!

এ কথা ভাবতে ভাবতেই বহুদিন বাদে রানীর পোড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠছিল।

ভাগ্যিস এখন রাত। ভাগ্যিস এখন নলিনীপিসি ওদিক ফিরে ঘুমোচ্ছেন তাই কেউ দেখতে পেল না, এই যা।

মাঝে একটু তন্দ্রামত এসেছিল যখন, তখন যেন কাদের কথাবার্তা, হাসির টুকরো ঘুমের ভিতর গিয়ে বিঁধছিল রানীর। ওরা বোধ হয় সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর সেই আরো বড় মানুষ মধ্যরাত্রের যাত্রী। যারা সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর এক আদুরী মামাতো বোনকে পৌঁছে দিয়ে যাবে নামখানায়। তাদের জন্যেই অপেক্ষা! নাহলে 'রাজে-ন্দ্রাণী'তো সন্ধ্যেবেলাতেই ছাড়তো!

স্টীম লঞ্চ এখন জলে।

'কলকাতায় কত দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে, মাঝরাতে একা জেগে জেগে স্টীমারের বাঁশি শুনেছে। বিশেষ করে একত্রিশে ডিসেম্বর মধ্যরাতে—যখন জাহাজের ভেঁপুতে কেবলই পুরোনো বছরের পেট ফাটিয়ে নতুন বছরের বেরিয়ে আসার আনন্দ-সংবাদ। কিন্তু তখন গঙ্গায় যতই জলযান দুলুক রানীর অনড় বিছানার তলায় কোন দুলুনি ওঠে নি। এমন জোলো হাওয়ার ঠাণ্ডা ঝাপটা লাগে নি চোখে মুখে। বিশ্বাসই হয় না, আজ ভোরেও রানী কলকাতায় ছিল।

সেই ভোর পাঁচটায় রেবতী পিসির বাড়ির সামনে সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর মস্ত মস্ত দুটো স্টেশন ওয়াগন এসে থেমেছিল। সুহাসদা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সগর্বে ওর শ্বশুর অজিত পিসেমশাইকে বলেছিলেন, দেখেছেন বাবা, সোমেশ্বরদার কি টাইম জ্ঞান। পাঁচটা তো ঠিক পাঁচটাই—

রানীরা সবাই রেডি হয়েই ছিল। রেবতীপিসি, নলিনীপিসি, অজিতপিসেমশাই, সুহাসদা, নূপুরদি।

তারা সবাই গঙ্গাসাগর মেলায় যাচ্ছে। কাল রাতে হঠাৎ সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

বড় বড় স্টেশন ওয়াগন দুটো যখন ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, রানী তখন একা একা নূপুরদির পাশে বসে বসে মৃত্যুকে ছোট্ট একটা মিনিয়েচার স্মৃতিসৌধের মতো নিজের ভিতরে রেখে দিচ্ছিল। একটা আশ্চর্য সময়হীনতার বোধ তার মধ্যে উদাস হয়ে ঘুরছিল একা একা। হঠাৎ ধক্ করে মনে হয়েছিল তার, কোন মানে হয় না। এভাবে বাঁচার, এভাবে দিনের পর দিন বৃথা কাটিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। নিজের হাতের মুঠোয় নূপুরদির দেওয়া ইংরেজি 'আর' অক্ষর এমব্রয়ডারি করা নরম লেশের রুমালটা পিষে ধরে, রানী তার চোখ ঝেঁপে আসা বৃষ্টি রোধ করেছিল। তাই তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজও বেরোয় নি।

তারপরই রুমালটা আর খুঁজে পায় নি রানী। আসন্ন মৃত্যুর চেয়েও রুমালটা হারিয়ে ফেলার জন্যে রানীর মনে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্য, না? এখন তাই ঝক্ ঝক্ শব্দ করে স্টীম লঞ্চটা চলতে আরম্ভ করতেই রানী উঠে বসল।

তার বুকের ভিতরও এই লঞ্চের মাঝখানকার প্রাণঘরের ভিতর লুকোনো আগুনের হৃৎপিণ্ডটায় কেউ যেন ক্রমাগত কয়লা ঠেলে দিচ্ছে।

ছোট্ট বাক্সের মতো, একটা কাঠের কেবিনের গা থেকে ঠিক ডেস্কের ড্রয়ারের মতো ঝোলানো, নরম বিছানা। তুলতুল্ করছে পুরু তোষক। ওপরে মোলায়েম শাদা লিনেন পাতা। এ সব বিছানায় রানী জীবনে কখনো শোয় নি। স্টীমারে উঠে গরম জলে, দামী সাবান মেখে স্নান করেছে। গায়ে নলিনীপিসির দেওয়া সুগন্ধি পাউডার মেখেছে। এখন তার পরণে নূপুরদির দেওয়া ফিকে গোলাপী রঙের ফ্লানেলের রাত-পোশাক। নূপুরদির বিয়ের আগের জিনিস। রাত-পোশাকটা এতদিন নূপুরদির কুমারী বেলার আলমারিতে তোলা ছিল। তাই একটু ন্যাপথলিনের গন্ধ লেগে আছে। কিন্তু তাতেও এই সাগরের শীত যায় না। এই জানুয়ারী মাসের তীক্ষ্ণ কন্‌কনে হাড়ে বিঁধোনো সাগরে হাওয়া। রানী তাই বুকের ওপর পর্যন্ত দু'হাতে চেপে ধরেছিল নরম সাটিনের লেপের ওপর রাখা মোলায়েম পশমের কম্বল।

কেবিনের যে দিকে জানালা, রানী সেদিকটাই বেছে নিয়েছে নলিনীপিসি সানন্দে ছেড়ে দিয়েছেন ওদিকটা। ওঁর আবার 'কোল্ড এ্যালার্জি' আছে। পুরো পশমের রাত-পোশাক পরে, মাথায় নাইট ক্যাপ এঁটে পুরু দু'প্রস্থ লেপের তলায় শুইয়ে দিয়েছে রানী নলিনীপিসিকে। রানীর দিকের খোলা জানালা কাচের শাটার আর কাঠের ভেনিসিয়ান ব্লাইণ্ড দিয়ে বন্ধ করা যায়। তাছাড়াও ভয়ঙ্কর দুর্যোগের জন্য আলাদা করে গোটানো আছে সবুজ ক্যাম্বিসের ঢাকা। রানী কেবল কাচের শাটার টেনে দিয়েছিল। এখন নলিনীপিসি ঘুমিয়েছে। রানী অতি সন্তর্পণে কাচের শাটারটাও তুলে দিল।

অমনি বাইরে থেকে ঝাঁপিয়ে এলো ঠাণ্ডা, শব্দ আর আলো। নলিনীপিসির দিকে সন্তর্পণে আর একবার চেয়ে নিল রানী। নাঃ সাড়া নেই। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে রানীর সঙ্গে নানা রকম গল্প করছিলেন নলিনীপিসি। বেশ লাগছিল শুনতে। বিদেশের কথা, চাকরির কথা, বন্ধু-বান্ধবের কথা। রানী যদি বেঁচে থাকার ইচ্ছে রাখতো, তাহলে কিন্তু দিব্যি জুটে যেতে পারতো নলিনীপিসির সঙ্গে। সাগরমেলা থেকে ফিরে তিনি ভারত-ভ্রমণে বেরোবেন। রেবতীপিসি সেইজন্যেই কাল বিকেলে হোস্টেলে জরুরী তলব করেছিলেন রানীকে। নাঃ নলিনীপিসির সঙ্গিনী হয়ে ভারত ভ্রমণ করতে মন্দ লাগতো না হয়তো রানীর। বুড়ো মানুষের একটু আধটু সেবাযত্নের বদলেও যে পয়সা পাওয়া যেতে পারে এবং বেড়াবার সুখ-সুবিধা এ খবরটা রানী শুনেছিল। রেবতীপিসি যে টাকার পরিমাণ আর সুবিধের কথা বলছিলেন তা রানীর কল্পনারও বাইরে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করে উঠল রানীর। আসলে ঘুমটা তার একদম ছেড়ে গেছে। আসলে বড় বেশি রকম জেগে গেছে রানী। এতটা জাগা তার উচিত হয় নি। এত বেশি বড় জাগার জন্যে খুব বড় রকম, বড় মাপের ঘুম চাই।

কিন্তু কোথায় ঘুম ?

লম্বা সুন্দর পরিচ্ছন্ন এক শিশি ঘুম সে হঠাৎ কোথাও হারিয়ে ফেলেছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হচ্ছে যেন উৎসব। আলোয় ঝলমল নামখানা জেটি। সেখানে এত রাত্রেও কি ভিড়। সেই ভিড় থেকে ধক্ ধক্ করে সরে যাচ্ছে 'রাজেন্দ্রাণী'। দূরে কাদার ওপর কাঠের লম্বা লম্বা পাটা ফেলা। বিদ্যুতের অস্থায়ী তার টেনে টেনে আলোয় আলো চারিদিক। লাউড স্পিকার। সার সার তাঁবু ফেলা। রানীদের গাড়ি ওই সব পেরিয়ে পেরিয়ে এসেছিল। টিকেঘর, হেল্‌থ অফিস, লাইজলের গন্ধ। ব্লিচিং পাউডার ফেলা

নর্দমা। হালুইকরের দোকান। মুক্ত মাঠের মাঝখানে।হম আকাশের তলায় আগুন জ্বেলে বসে থাকা অতি দবিদ্র যাত্রীদের মেলা। অসংখ্য যাত্রীর দল অপেক্ষা করে আছে। গঙ্গায় অসংখ্য লঞ্চ, গাদা-বোট, দেশি নৌকো। সব যাত্রী বোঝাই, সাবা রাত যতবাব সম্ভব ততবার সাগরদ্বীপে মানুষ বযে নিযে যাবে এক একটা লঞ্চ। নৌকো তীরে এসে লাগছে, আব নিমেষে ঠেসে যাচ্ছে মানুষ।

সবাই মকর সংক্রান্তির পবম পুণ্য লগ্নে সাগবে যাচ্ছে।

সাগরে যাচ্ছে।

কোলেব ওপর ... হাত জোড করে তীরভূমিব দিকে চেযে বইল বানী। কালো আলকাতরাব মতো ঠাণ্ডা জলে আলোর বড বড সাপ খেলা কবে বেডাচ্ছে। রানী যেন নিজেব ভিতবে গিযে দু'হাত দিযে তুলে ধরল নিজেকে। তাবপব সক্রোধে, ঘৃণায বলে উঠল, 'চল্, তোবে দিয়ে আসি সাগবেব জলে।'

ধক্ ধক্ ধক্ ধক্

অদ্ভুত ধাক্কা দেওযা একটা আওযাজ। নামখানা থেকে সরে যাচ্ছে স্টীমলঞ্চটা। সোজা জলের জগতে প্রবেশ কবছে। ঘন কুয়াশায ছোট আর লালচে হয়ে ক্রমাগত হারিযে যাচ্ছে আলোর পবে আলো। যেন টপ টপ কবে পডে যাচ্ছে আধাবের সমুদ্রে। আর ঝাপিযে আসছে অন্ধকাব। বুনো হযে উঠছে, পোষা হাওয়া। জল থেকে উঠে আসছে শেওলাব জলজ গন্ধ। রানীব বুক থেকে মুখ থেকে আলো কমে আসছে। ক্রমশ ফিকে হযে আসছে সভ্যতার, —মানুষেব আওযাজ।

এভাবেই বোধ হয মৃত্যু সময়ে মানুষেব শবীব থেকে জীবন ক্রমশ ক্রমশ নেমে যেতে থাকে।

যদি কালকেই ঘুমের বডিগুলো খেযে নিতে পাবত রানী তাহলে হযতো এতক্ষণে তাব সমস্ত দেহ থেকে জীবন ক্রমশ ক্রমশ গুটিযে সরে সরে চলে যেত।

আর রেবতীপিসির গেস্টরুমে পড়ে থাকতো তার শক্ত কাঠ দেহটা।

আর রেবতীপিসি হয়তো বেলা দশটার আগে খোঁজও করত না রানীর। কারণ রেবতীপিসি জানে রানী যখনই রেবতীপিসির কাছে আসে তখনই সে দেহে মনে দেউলে হয়ে আসে। তার শরীর এত ক্লান্ত এত পরিশ্রান্ত হয়ে থাকে যে রানীকে কেউ বিরক্ত করে না। একটা গোটা দিন, কিংবা তুটো দিন রেবতীপিসির কাছে এলে রানী কেবল বিছানায় গড়াতো।

তবে কালকের কথা আলাদা। কাল তার সম্পূর্ণ অন্য প্ল্যান ছিল। সে ঠিক করেছিল ঘুমের বড়িগুলো পর পর খেয়ে হাঁটতে আরম্ভ করবে। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে ভিক্টোরিয়ায়। তার হাতে থাকবে ছোট্ট চামড়ার আধছেঁড়া চামড়ার ব্যাগটা। তাতে থাকবে তুখানা চিঠি।

রানীর একটা দিক যেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল, আর একটা দিক বোধ হয় ততটাই থস্‌থসে, সেন্টিমেন্টাল। নাহলে সে কখনো শ্বেত-পাথরের ওপর মরতে চায়? সুন্দর করে মরতে চায়!

নাঃ, ফাঁকা সেন্টিমেন্টালিটিই বা কেন? প্রত্যেক মানুষই তো তাই চায়। সুন্দর করে, সুন্দর জায়গায় মরতে। একুশ বছর বয়সে রানী তাই-ই চেয়েছিল। কিন্তু রেবতীপিসি হঠাৎ তার হোস্টেলে ফোন করে তাকে ডেকে পাঠালেন, নাকি জরুরী দরকার। রানী রেবতীপিসি ডাকলে—যাবেই। কারণ নানা কারণে ওই পরিবারটির কাছে সে ভয়ঙ্কর ভাবে ঋণী।

রানীর এখন কোন বাঁধা চাকরি নেই। তাই কোন অসুবিধাও ছিল না। গিয়ে শুনেছিল রেবতীপিসির এক বান্ধবী বিদেশ থেকে এসেছেন। তিনি ভারতদর্শনে বেরোবেন, তাই সঙ্গিনী চান। রানীর তো এখন কোন আয়ের ব্যবস্থা নেই। রেবতীপিসি তাই রানীর জন্যে যথেষ্ট ভেবেছেন।

অবশ্য রানীর জন্যে রেবতীপিসিকে আর খামোখা ভাবতেও হবে না। কারণ রানী . । কিন্তু রানী মুখে বলেছিল সে যাবে। নলিনী-পিসির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু মনে মনে কেঁদে উঠেছিল।

তাহলে কি শেষ পর্যন্ত রেবতীপিসির ওই মস্ত খাঁ খাঁ বাড়ির ছোট গেস্টরুমেই রানী শেষ হয়ে যাবে? ওই ধুলো পড়া নিরানন্দ ঘর। কাঠের খাট। দাগ ধরা ধুলো পড়া টেবিল। চরিত্রহীন একটা আলমারি আর আলনা। পলেস্তরা খসা দেয়াল। জানালা খুললে কোন আকাশ নেই। আর একটা বাড়ির দেয়াল। বেশ! এই যখন নিয়তি, তখন রানী ওই নিশ্চরিত্র ঘরে, হ্যাড়া একটা বাল্বের তলায়, মশা বিনবিন্ রাত্রে, একা একটা থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো মরবে। তাই, সে সঙ্গে এনেছিল তার ছোট রেক্সিনের স্যুটকেশ আর আধছেঁড়া চামড়ার হাতব্যাগটা। রানী যদি আর দুটো দিনও বাঁচার ইচ্ছে রাখত, তাহলে ওই হাতব্যাগটা তাকে ছাড়তেই হত। কারণ আজকাল প্রায়ই হাতব্যাগের ছেড়া ফুটো দিয়ে, পয়সা কলম এইসব ছোট খাটো টুকিটাকি জিনিস পড়ে যায় তার।

রাতে নলিনীপিসির ঘরে গিয়ে আলাপ করেছিল সামান্য। তারপর রেবতীপিসি আর অজিতপিসেমশায়ের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়েছিল। দাসী কার যেন ব্যবহার করা একটা শস্তা ধরণের আধময়লা বেড্‌কভার পেতে দিয়েছিল, রানী কোন প্রতিবাদ করে নি।

অন্য অন্য দিন সে কতক্ষণ ধরে ঘর পরিষ্কার করে, গুছোয়। ধুলো ঝাড়ে, ধূপ জ্বালায়। কাল ধপাস্ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। ঘর গুছোয় নি, ধুলো ঝাড়ে নি, কাপড় ছাড়ে নি। হাত মুখ ধোয় নি। শুধু সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার যাবতীয় জাগতিক সম্পত্তি। শস্তা লাল রেক্সিনের স্যুটকেশটা আর হাতব্যাগ। আর এনেছিল এক জগ জল আর একটি কাচের গ্লাশ। তারপর আলো নিভিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল।

ঘরটা তো কাল রানীর কাছে ঘর ছিল না। ছিল একটা ওয়েটিং রুম মাত্র। ওয়েটিং রুমে কি মানুষ মেঝে নিকিয়ে ঝুল পরিষ্কার করে সংসার পাতে? শেষ সফরের আগে কি কেউ সাজতে বসে? রানী তাই আলো নিভিয়ে তার সেই আধছেঁড়া ব্যাগটা খুলেছিল। ঘুমের বড়ি ভরা শিশিটা বের করার জন্যে। লম্বা কাচের শিশি। বড়িতে ভর্তি। কিন্তু ব্যাগে শিশিটা নেই! পাগলের মতো খুঁজতে আরম্ভ করেছিল রানী। কোথায় গেল শিশিটা? বাসে? ট্রামে? রাস্তায়?—সে যখন রেবতীপিসির ঘরে গিয়েছিল, তখন তার হাতে ব্যাগটা ছিল। সেখানেও পড়তে পারে। নলিনীপিসির ঘরেও পড়তে পারে। কিংবা—

ঠিক তখনই নীচে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। ঘ্যাঁচ্ করে গাড়ি থামার শব্দ। গেট খুলে গেল। তারপরই কলিঙ্ বেল্। হৈ হৈ করে নূপুরদি আর সুহাসদার ওপরে উঠে আসা। রানী টের পাচ্ছিল। যেন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনি ভঙ্গী করে রানী আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতর মুঠো করে উঠল একটা ভয়। সুহাসদার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাক্—এ ব্যাপারটা রানী একেবারেই চায় নি।

কে জানে সুহাসদা নূপুরদিকে সব বলে দিয়েছে কিনা? পুরুষদের কোন বিশ্বাস নেই।

অন্ধকারে একা ঠোট কামড়ে ধরেছিল রানী।

ঠিক তখনই দুম্‌দাম্ করে প্রায় দরজা ভেঙে ঢুকেছিল নূপুরদি। ফটাস্ করে আলোর সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

—এই রানী, রানী ওঠ ওঠ্! বেশ হল তুই এখন এ বাড়িতেই আছিস। আমরা সববাই কাল গঙ্গাসাগরে যাব।

রানী উঠে বসেছিল। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নূপুরদির দিকে। ওর দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নূপুরদি বলেছিল, কি রে? তোর আনন্দ হচ্ছে না? এই, অমন মুখ করে আছিস কেন রে তুই?

রানী স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলেছিল, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে নূপুরদি!

সত্যি রঙীন সিল্কের শাড়িতে একেবারে ঝল্‌মল্‌ করছিল নূপুরদি। নূপুরদি বলেছিল, যাঃ, কি এমন—

—তা হঠাৎ গঙ্গাসাগর?

—আর বলিস না। তোর জামাইবাবুর তো সবই হঠাৎ হঠাৎ। তার ওপর জুটেছেন আর এক পাগল। ওই সোমেশ্বর রায়চৌধুরী। 'উঠল বাই তো কটক যাই'। এই আর কি। অঢেল টাকা আর অঢেল মেজাজ। আজ সন্ধ্যেবেলা সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদি ট্রাঙ্ক করলেন,—সোজা কলকাতায় চলে এসো। বন্ধু-বান্ধব যত পারো আনো, আমরা সাগরে যাব। উনি তাড়াতাড়ি জেনারেল ম্যানেজারকে ধরে-টরে ছুটি নিয়ে নিলেন। ব্যস্‌! এখন সেই সুখাপুখুরিয়া থেকে সোজা ড্রাইভ করে আসছি। বন্ধু-বান্ধব আর কাকে পাই বল্‌ এত রাতে। আমাদের মতো পাগল আর নির্ঝঞ্ঝাট আর কে আছে বল্‌। তাই ভাবলাম বাবা-মাকেই নিয়ে যাই। হাজার হোক তীর্থ বলে কথা। সাগরে মরে যেতে পারলেও তো পুণ্যি, তাই না?'

রানা পাগলের মতো হেসে উঠে বলেছিল, 'চল্‌ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' বল্‌ না রে নূপুরদি। সেই রাখালের মায়ের মতো।

—ইস্‌স্‌ কেন বলব? তুই আমার কত আদরের বোনটা! তারপর প্রসঙ্গ পালটে ছিল নূপুরদি।

—হ্যাঁরে, মা বলছিলেন নলিনীমাসিও আমাদের সঙ্গে যাবেন!

—হ্যাঁ, গেলে, তো ভালোই হয়! উনি তো ভারত-দর্শনে বেরোবেন!

নূপুরদি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। ও—এতক্ষণে বুঝেছি। লীনা-মাসি, লীনামাসি। মায়ের ছোটবেলাকার বন্ধু। দারুণ বন্ধু। 'বাব্বা, ছোটবেলা থেকে কত গল্পই না শুনেছি। মা'র বিয়ের পর পরই

বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে এই মোটা মোটা খাম আসতো। কত রকম প্রেজেন্টেশন পাঠাতেন লীনামাসি। মা-ও পাঠাতো। কতবার শুনেছি আসছেন আসছেন। মা বলতো লীনা মাসি কলকাতায় এলে আমাদের কাছেই উঠবেন। কিন্তু কখনো আসতে পারেন নি এর আগে। এই কেমন দেখতে রে লীনামাসি ? বাংলা বলতে পারেন ভালো করে ? কবে এসেছেন রে ?

—আজই !

বেশ হল। নীচে যাই। কালকের যাওয়ার ব্যাপারে বাবা-মায়ের সঙ্গে কনফারেন্সটা সেরে নিয়ে তারপর দুই বোনে বাকি রাতটা শুয়ে শুয়ে গপ্পো করব।

হাল্কা সিগারেটের গন্ধে দরজার দিকে তাকাতেই রানী দেখল দু'হাতে দরজার দুটো পাল্লা ধরে সুহাসদা একটু ঝুঁকে পড়ে তাকে আর নূপুরদিকে দেখছে। বিশেষ করে নূপুরদিকে !

নূপুরদিকে শুধু দেখছে না,—যেন নূপুরদির মুখের রেখায় রেখায় কিছু খুঁজছে।

রানীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুহাসদা গূঢ় চোখে রানীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিল, ভালো আছ ?

রানী বলেছিল, আছি !

সুহাসদা হঠাৎ বলেছিল, এই রানী, এক কাপ চা খাওয়াও না !

রানী হেসে উঠে পড়েছিল। বাইরে ব্যালকনিতেই একটু আড়াল দিয়ে হিটার কেট্‌লি গুছিয়ে রাখা। এ বাড়ির ব্যবস্থা খুব ভালো। কষ্ট নেই। একটু হাত নাড়লেই হল।

বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে রানী শুনেছিল নূপুরদি বলছে, শুধু শুধু বেচারাকে কষ্ট দেওয়া। যাও, এখন নীচে যাও। নীচে গিয়ে বাবা মাকে কনভিন্স কর। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। প্লিজ্। আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে একটু পরেই নীচে চলে যাচ্ছি।

সুহাসদা বলেছিল, আমাকেও একটু সামলাতে হবে নূপুর। আঘাতটা আমারই কি বেশি লাগবার কথা নয়? আমিও একটু চুপচাপ বসে থাকতে চাই। একা। তারপর সুহাসদা বাইরে বেরিয়ে রানীর পাশ দিয়ে ব্যালকনির অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। নূপুরদি একাই বসে ছিল ঘরে।

চা তৈরি করে সুহাসদাকে দিয়ে এসে রানী দু' পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। বিছানায় বসেছিল নূপুরদি। ঘরের আলোগুলো সব জ্বালা। নূপুরদি হাত বাড়িয়ে চা-টা নিয়ে, পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, হ্যাঁ রে, তার সোনার রিঙ মাটিতে পড়ে ছিল কেন?

- সোনার রিঙ?

হেসে উঠেছিল রানী। সে বুঝতে পেরেছিল তার ব্যাগের ফুটো দিয়ে ইউনিক্ গোল্ডের রিঙ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তাহলে কি ওই পথেই?...ওই ঘরেই?... রানী তাড়াতাড়ি উবুড় হয়ে খুঁজতে গেল শিশিটা সরু,—লম্বা—ঘুমের বড়িতে ভর্তি। নূপুরদি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, রিঙ খুঁজছিস?—ওই যে, ও দুটো ওই টেবিলের ওপর।

রানী বলেছিল, না, আমি দেখছি, ব্যাগের ছেঁড়া ফুটো দিয়ে আর কিছু নীচে পড়ে গেছে কিনা?

—আর কি পড়বে? কিচ্ছু পড়ে নি,—চল্ আমার ঘর খুলে দিয়েছে। দুই বোনে ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

—সুহাসদা?

—ও এটুকু রাত এই গেস্ট রুমেই শুয়ে নেবে'খন।

রানী তবু ঘরের মেঝেটা ভালো করে লক্ষ্য করতে করতে যাচ্ছিল। সত্যি! দারিদ্র কি সর্বনাশা বস্তু। এমন কি মৃত্যুর শান্তিও পেতে দেয় না মানুষকে।

রানী যদি দরিদ্র না হত, তাহলে নিশ্চয়ই ছেঁড়া একটা ব্যাগ খামোখা ব্যবহার করত না সে।

এখন এই ঝুলন্ত বিছানায় বসে রানী একটা লঞ্চের ধক্ ধক্ শব্দ শুনছে। নামখানা হারিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেছে তীর-ভূমির যোগ। বাইরে এখন কেবল কালো জল আর কালো আকাশ। গাঢ় কুযাশা নেমে এসে ক্রমশ জমা হচ্ছে জলের কাছে। আকাশে তারাগুলো তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার শেষ বিন্দুর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এখন সেই ঘুমের বড়ির শিশিটা আর সঙ্গে নেই তার। কিন্তু এখনো রেবতীপিসির গেস্ট রুমের মতো এই লঞ্চ-এর কেবিনটাও তার ওয়েটিঙ রুম। মৃত্যুর সেই ভয়ঙ্কর কালো ট্রেনটা এখনো অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। কখন শেষ ঘন্টি বাজবে কেউ জানে না। কারণ ঘুমের বড়ির শিশিটা তার কাছে আর নেই। তাকে এখন অন্য রকম মৃত্যুর কথা ভাবতে হবে। সমস্ত সময়টাকে অনিশ্চিত আর অর্থহীন করে রেখে দিতে হবে।

আজ সারাদিন সারা সন্ধ্যে সে যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে এসেছে, তাতে তার শরীর থেকে ক্লান্তি জ্বালা ঘাম অপরিচ্ছন্নতা আর ফুটন্ত উৎকণ্ঠা ক্রমশ নেমে নেমে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে এত দূরে এই জলের মধ্যে বসে এখন তার স্নায়ুগুচ্ছ শান্ত। এলানো চুলের মতো তার শিরাগুচ্ছ ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। এখন তার গায়ে নরম রাত-পোশাকের সুগন্ধি সুখস্পর্শ। নরম কোমল লেপের আরাম। এখন রানী ঘুমের বড়ির চেয়ে তার মৃত্যুর জন্যে একটা সুন্দর শুভ্র কারুকার্যখচিত স্মৃতিসৌধের মতো, ঠাণ্ডা মার্বেলের পাল্কী চায়।

রানী যেন দেখতে পাচ্ছে একটা শীতের কুয়াশা ঢাকা মগ্ন ভোর; শিশিরে পালিশ করা চক্‌চকে কষ্টিপাথরের মতো রাস্তা। পাল্কী বেহারার একটানা গানের মতো মৃদু চাপা কান্নার রোল। তার ভিতর বসে ঈষৎ পর্দা তুলে মৃত্যুর দেশের চেহারা দেখতে দেখতে রানী যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টুপ্‌টাপ্ ঝরে পড়ছে শিশির বিন্দু।

ছবি বদলে যেতে লাগল ক্রমশ। বুকে বিঁধতে লাগল বিষাদের তেরছা ছাঁটগুলো।

রানী নিজেকে দেখতে পেল শিয়ালদা থেকে ছাড়া একটা ট্রেনে ঝপাঝপ্ পেরিয়ে যাচ্ছে মাঠ ফসল ঘর বাড়ি। দুপুরে সে যুগল সেনকে ফোন করেছিল। যুগল জানে এক একটা ফোন পিছু রানীর পঁয়ত্রিশ পয়সা করে পড়ে। এবং রানীর এখন কোন বাঁধা চাকরি নেই। যুগলকে ফোন করলেই যথারীতি অপারেটর পাল্টা প্রশ্ন করে,—আপনি কে ফোন করছেন? রানী তার নিজের নামই বলেছিল। বলেই অবশ্য সে জানত তার জন্যে কি উত্তর অপেক্ষা করছে। যথারীতি অপারেটর বলেছিল—উনি বেরিয়েছেন। কিছু বলতে হবে?

রানী বলেছিল—উনিই কথাটা বললেন বুঝি?

অপারেটর আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কি, কি বললেন?

—নাঃ, বলছি যুগল সেন যে নেই সে কথাটা বুঝি যুগল সেনই আপনাকে বলে দিলেন? শিগগির ফোনটা যুগলকে দিন।

ব্যাপারটা বাস্তবে এমন ঘটে না। বাস্তবে অপারেটর বলে—উনি বেরিয়ে গেছেন, আর রানী ফোন নামিয়ে রাখে। কিন্তু রানী স্বপ্ন দেখছিল। এবং বুঝতেও পারছিল যে ও স্বপ্ন দেখছে। আর স্বপ্নের মধ্যে তো অসম্ভব রকম সব ঘটনা ঘটেই। রানীর স্বপ্নেও, রানী তাই ঘটাতে লাগল।

যুগল ফোন ধরতেই রানী ভিক্টোরিয়ায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসল।

স্বপ্নের মধ্যে রানী ইচ্ছে করলে আরো দেরী করতে পারতো। কিন্তু সে হোস্টেলে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। কি নিয়ে ওই নিরানন্দ কোণে বসে থাকবে সে? তার মা নেই, বাবা নেই, ঘর নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, চাকরি নেই। তাই তো সে হঠাৎ প্রশ্রয় পেয়ে গিয়ে ওই যুগলকেই আঁকড়ে ধরেছে।

স্বপ্নের রঙে ক্রমশ যেন একটা নীল বিষাক্ত ধোঁয়া এসে মিশতে লাগল। রানীর এ্যাপয়েন্টমেন্ট ভিক্টোরিয়ায়। সে শিয়ালদা থেকে

একটা বাসে চড়ে সিধে ভিক্টোরিয়ায় যেতে পারতো। কিন্তু তার বুকের ভিতরে খামচে খামচে ধরছে একটা ভয়ংকর আতংক। সে জানে যুগল সেন আসবে না। সন্ধ্যে ছ'টার পর অন্ধকার নেমে গেলেও আসবে না। সারা ময়দান খালি হয়ে গেলেও আসবে না।

তাই উত্তেজনা এড়াতেই এই ঘুর পথ।

শেয়ালদা থেকে রানী খামোখা বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত যাবে, তারপর সেখানে নেমে আবার এসপ্ল্যানেডের দিকে যায় এমনি কোন বাসে উঠবে। ব্যাগে গোনাগুনতি পয়সা। তা সত্ত্বেও স্বপ্নের ভিতরও, ঠিক বাস্তবের আদলে এই বাড়তি খরচ।

স্বপ্নের ভিতরেও রানীর বুকের মধ্যে ভাবনা। সামনের মাসের হোস্টেল ফি-র এখনো কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি সে। দুশ্চিন্তায় ঘুমের মধ্যেও এপাশ থেকে ওপাশে উল্টে গেল সে।

স্বপ্নের রানীর পরনে দোকান থেকে কেনা রেডিমেড ব্লাউজ। ঠিকঠাক্ ফিট্ করে নি। শাড়িটা যদিও ছাপা সিল্কের কিন্তু ধুলধুলে পুরোনো আর আধময়লা। একটু জোরে হাঁটতে গেলেই পায়ের কাছে ফেটে যায়। তাছাড়া এ শাড়িটা যুগল অনেকবার দেখেওছে।

যুগলের অফিসে রানী যেদিন প্রথম গিয়েছিল সেই দিনও এই শাড়িটা পরে গিয়েছিল সে। সেদিন খুব একটা স্মার্টনেস দেখাবার জন্য যুগল রানাকে সামনের টেবিলে বসিয়ে আর একটি ফোনে প্রার্থী মেয়েকে অপারেটরকে দিয়ে মিথ্যে ফোন করিয়ে বলেছিল যে, সে অফিসে নেই। সে বেরিয়ে গেছে।

সেদিন যুগলের কাছে আলাদা ইমপর্টেন্স পেয়ে রানীর খুব আত্মপ্রসাদ হয়েছিল। সে ভেবেও দেখে নি যে যুগল সেন তার সামনে আর একটি মেয়ের অবমাননা করছে। না। কোন অপরাধই ফেলা যায় না। রানী তাই আজ এত অপমানিত। স্বপ্নের মধ্যেই রানী আবার পাশ ফিরল।

একা একা ভিক্টোরিয়ার পাশের ফুটপাথ ধরে অন্তহীন রেলিঙের

পর রেলিঙ,— রেলিঙের পর রেলিঙ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নের মধ্যেই রানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সে যখন চমকে জেগে উঠল, তখনো সে বিড়বিড় করে কিছু বলছিল। তাড়াতাড়ি উঠে সে নলিনীপিসির বিছানার দিকে তাকালো। তার কান্নার শব্দে নলিনীপিসির ঘুম ভেঙে যায় নি তো।

লঞ্চের ধক্ ধক্ শব্দ সত্ত্বেও সে কান পাততে চেষ্টা করল। এবং নিশ্চিন্ত হয়ে শুনল নলিনীপিসি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

এই ছোট কেবিনের গাঢ় অন্ধকারে রানী ডুবে আছে। তার একুশ বছরের সামনেও আরো গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারে এ জীবনটার আর কোন মানে নেই তার কাছে। না, শুধু প্রেম নয়। ভালোবাসা নয়। হয়তো আদৌ প্রেম-ভালোবাসাই নয়, যুগলকে রানী তার আর কেউ নেই বলেই এতখানি আকড়ে ধরেছিল। যুগল তাকে যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সময় দিয়েছে তেমনটা সে কোন দিন পায় নি। পাবার কল্পনাও করে নি। কারণ পুরুষরা মনোযোগ দিলে, আন্তরিকতা দিলে যে এতখানি মধু ঝরে তা রানী যুগলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে কি করেই বা জানতো? রানী আর তো কোন পুরুষকে কাছে পায় নি।

কোন মানে হয় না। আপন মনেই বলে উঠল রানী। তারপর পাশ ফিরে শুলো।

পাশ ফিরতেই হঠাৎ জেগে উঠল রানী। স্বপ্ন ভেঙে গেল। হঠাৎ তার হাতে ঠেকে গেল নূপুরদির সেই টিনের টফির বাক্সটা। বাক্সটার চারপাশে যেন রানীর ছোটবেলার অনেকখানি আকাঙ্ক্ষা আটকে আছে। ছোটবেলায় কতবার যে রানী নূপুরদির কাছ থেকে বাক্সটা চেয়েছিল, নূপুরদি দেয় নি। পরে রানী শুধু নূপুরদি আলমারি খুললে নানান ছুতো করে বাক্সটা ছুঁতে আর ধরতে চাইত। বাক্সটার ডালার ওপর ছিল একটা বিলিতি গ্রামের রঙীন ছবি।

একটা সুখী কুটির। তার দরজায় দুটি ছোট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, আর একটা বেঁকে যাওয়া রাস্তা। ছবিটা সে মুগ্ধ হয়ে দেখত আর তার মোলায়েম এনামেলের গায়ে হাত বোলাত। বলত,—নূপুরদি, আমার আর হস্টেলে থাকতে ভালো লাগে না। বড় হলে আমরা এমনি একটা বাড়ি বানিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকব।

আজ ভোরে যখন নূপুরদি আর রানী কাপড় বদলাচ্ছিল তখন নূপুরদি হঠাৎ তার কুমারীবেলার সেই মস্ত আলমারিটা খুলে বলেছিল, —'রানী, বল্ তুই কি নিবি? নিয়ে নে, তোর যা ইচ্ছে নিয়ে নে।

আলমারি ঠাসা কত পোশাক কত জিনিস কত বই।

হঠাৎ সেই টফির বাক্সটা হাতে দিয়ে নূপুরদি বলেছিল,— রানী, এই বাক্সটা তুই নিবি? নে না বাক্সটা!

প্রথমে সত্যিই রানীর খুব লোভ হয়েছিল। একেই বলে মানুষের মন। সে হাতও বাড়িয়েছিল। তারপর একে একে সব মনে পড়েছিল তার। রানী বাক্সটা আদৌ নেবে কেন? কাছে রাখতে? হাত বোলাতে? তার প্রিয় জিনিস রাখতে?

কিন্তু রানীর তো আর কোন প্রিয় জিনিস নেই। সে কোন কিছুই তো আর কাছে রাখতে চায় না। এমন কি নিজেকেও না। তাই সে বিস্বাদ গলায় নূপুরদি'কে বলেছিল,—কি হবে আর নূপুরদি। তখন ছোট ছিলাম তখন কত কি ছেলেমানুষী করেছি। ও তুমি রেখে দাও।

নূপুরদি বাক্সটা জোর করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, —আমিও তখন কি অবুঝ ছিলাম। না রে? তোকে বাক্সটা ছুঁতেও দিতাম না। কিন্তু এখন……নে, তুই নে না। বাক্সটার ভেতর টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখবি।

রানী নিয়েছিল বাক্সটা। পরে খুলে দেখেছিল বাক্সটায় রয়েছে একটা ল্যাভেণ্ডারের শিশি। ভিতরে ল্যাভেণ্ডারের নির্যাস সময়ে ঘন হয়ে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। আর কয়েকটা লেশের কাজ করা

রুমাল। পরে গুণে দেখেছিল, চারটে। কোণে কোণে,—কি আশ্চর্য ইংরেজী 'আর' অক্ষরটা রেশমি সুতো আর জরি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। 'আর' অক্ষরটা রানীর নামেরও আদ্য অক্ষর।

নূপুরদি রানীর লাল রেক্সিনের স্যুটকেশে গুঁজে দিয়েছিল আরো কিছু টুকিটাকি। নিজের কুমারীকালের ফ্লানেলের রাত-পোশাক আর লাল উলের একটা স্কার্ফ।

কেন খামোখা?

—চল না, একটা ফ্যাশানেব্‌ল্‌ এ্যাট্‌মসফিয়ারে যাচ্ছিস, একটু ফ্যাশান করবি।

রানী একটা শুকনো শ্যামলা গরীবের মেয়ে। তার জন্যে আবার এত দরদের বাজে খরচ কেন? রানীর চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল। টফির বাক্সটা কেন যেন বুকের কাছে আঁকড়ে নিয়ে রানী আকাশের দিকে তাকালো। ওখানে তখন এক বিরাট প্যানারোমায় বিশাল হয়ে দাঁড়িয়ে ঝক্‌ঝকে কালপুরুষ নক্ষত্র মণ্ডল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝাপটা এড়ানোর জন্যে রানী মুড়ি-সুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল রানীর।

আস্তে উঠে কেবিনের দরজা সন্তর্পণে খুলে, সে লঞ্চের মুখের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। লঞ্চ পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলের মাঝখানে।

রানী গায়ে লাল পশমের স্কাফটা জড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। তার সামনে গঙ্গার বুকে ঢেউয়ের দ্রুত ওঠা-পড়া। ঈষৎ মাটিরঙা ঘোলা জলের সঙ্গে দূর সাগরের নীল মিশে অদ্ভুত একটা ইস্পাত রঙ ফুটে উঠছে। তার ওপর ক্রমাগত পড়ছে আলতার আঁচড়। পূব-আকাশ উষার আভায় ক্রমশ গোলাপী থেকে লাল হয়ে উঠছিল।

বাঁদিকে জলের ওপর কুয়াশার আবছা পর্দার আড়ালে ভাসছে

সাগরদ্বীপ। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙীন বিন্দুর মোজেক করা। তার ভিতরে ভিতরে মাথা তুলে আছে অসংখ্য শিবির। সারি সারি হোগলার স্টল। সবই গালিভারের দেশের মতো খুদে খুদে। তীরে সারি সারি মোচার খোলার মতো নৌকো বাঁধা। তাদের দাঁড়ানো মাস্তুল অজস্র কাঁটার মতো আকাশে উঠে আছে। দ্বীপের মাঝখানের উঁচু ওয়াচ-টাওয়ারটা আধখানা হারিয়ে গেছে কুয়াশায়। জলের তলার তীব্র রোলিঙের জন্যে এত বড লঞ্চ বা নৌকো সাগরদ্বীপের তীর পর্যন্ত যেতে পারে না। গঙ্গা এখানে অর্ধেক নদীর আর অর্ধেক সাগরের। সাগরদ্বীপের পিছল তীরের ওপর সজোরে আছড়ে পড়ছে। তাই বড় বড় লঞ্চ, স্টীমার আর যাত্রীভবা নৌকো মাঝগঙ্গায় দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট ফেরিনৌকোয় উঠে যাত্রীরা সাগরদ্বীপে যাচ্ছে। রানীর ডানদিকে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। উঁচু হয়ে যেন গোল সীমানার দিকে উঠে গেছে সমুদ্র। ওপাশে যেন পৃথিবীর আর একটি প্রান্ত। ওপাশ থেকে সাগরদ্বীপের দিকে যখন নৌকো-গুলো আসছে তখন প্রথমে দেখা যাচ্ছে মাস্তুল, তারপর পাল। তারপর নৌকোর সর্বশরীর। যেন ঢেউয়ের ওপর সোয়ারী হয়ে আসছে নৌকোগুলো। অবাক লাগছিল রানীর। এই পৃথিবীতে এমন দৃশ্যও আছে? এমন অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য! যদি কাল সে মরে যেত। তাহলে কী এই আশ্চর্য সূর্য ওঠার ছবি দেখতে পেত?

হঠাৎ উগ্র ঝাঁঝালো স্পিরিট আর ভারী তামাকের গন্ধের সঙ্গে একটা চওড়া উষ্ণ বুকের আশ্রয়ের মধ্যেই প্রায় চলে গেল রানী। মস্ত শরীরের সুন্দর সুপুরুষ সোমেশ্বর রায়চৌধুরী। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও শরীরেরই মতো জলদগম্ভীর। আর ভরাট। একটি হাত সস্নেহে রানীর কাঁধে রেখে তিনি বললেন, রানীভাই, রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

রানী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ!

তার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। ক্বচিৎ কখনো আধো অন্ধকারে,

ময়দানে ভিক্টোরিয়ায় যুগল সেন কাছে টেনে নিয়েছে তাকে। কিন্তু এভাবে পুরুষের খুব কাছে অবলীলায় চলে আসার অভ্যাস তার তেমন নেই বলে অস্বস্তি। কিন্তু রানী কিছুতেই সরে আলগা হয়ে আসতে পারছিল না। তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কারণ তিনি সম্পূর্ণ স্বাবলীল। এত সহজ [illegible] কাল ভোর থেকেই ভদ্রলোককে দেখছে। রানীকে ওইভাবেই ধরে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ডাকলেন, মালতী? মালতী?

মালতীবৌদি তার বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। একটু ঢিলে-ঢালা অগোছালো চেহারা। চোখের কোলে গভীর কালি ছাড়া মুখটি হুবহু লক্ষ্মী প্রতিমার মতো। লক্ষ্মী প্রতিমারই মতো। দুর্গা প্রতিমার মতো না। কারণ লক্ষ্মী প্রতিমার মুখের ছাঁচটা সুন্দর অথচ বেশ কেমন পুতুল পুতুল। মালতীবৌদির চেহারার মধ্যে কোন তেজই নেই। যেন বেশিভাবে জলে ফেলা, এলানো পদ্মের মতো। শরীরের সব স্খলন পতন, যেন বড় বেশি রকম দেখা যায় সকালের কুয়াশা-মোড়া সূর্যের আলোতে আলোর তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো তাল তাল সোনা ঝকঝক করছে। [illegible] হাতীপাড় ফরাসডাঙা শাড়ির ওপর [illegible] সবুজ জামিয়ার শাল। [illegible] গেছে [illegible] নাকছাবি [illegible]

সোমেশ্বর [illegible] বললেন, মালতী, [illegible] খেয়েছো [illegible] লেমন জুস? এখন [illegible] কম [illegible] গেছে তোমার? দুর্বল লাগছে না তো?

মালতীবৌদিকে আর এক হাতে জড়িয়ে নিজের [illegible] বুকে টেনে নিলেন সোমেশ্বর।

আদর খাওয়া বেড়ালের মতো সোমেশ্বরের কথার উত্তর দিচ্ছিলেন মালতীবৌদি। নিজেকে [illegible] মনে হচ্ছিল রানীর। সোমেশ্বরের সঙ্গে কথা শেষ করে মালতীবৌদি নিজের থেকেই বললেন, দেখ না রানী, একটু যদি বিশ্রাম পাই ওঁর জন্যে? এত

হুল্লোড় ভালোবাসেন! সঙ্গে তাল রাখা যায় না। কাল প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত আমাদের দারুণ মজলিশ চলেছিল। তোমার দাদা বৌদি আর আমরা দুজন একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। তাই ঘুম হল না। তার ওপর এত ভোরে আবার কখনো ফ্রেশ হয়ে ওঠা যায়? তার ওপর আমরা তো হলাম হোস্ট। আমাদের কত কাজ বল। তোমাদের কারো যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় সেটা তো আমাদেরই দেখতে হবে।

সোমেশ্বর হাসতে হাসতে বললে, মালতী ইয়্ আর লুকিং র‍্যাভিশিং মাইডিয়ার! আর আমার নিজের কথা তো বললামই না। আরে বাবা বোঝ না কেন তুমি আর আমি আমরা দুজনে হলাম গিয়ে একেবারে আলাদা মেক্।

মালতীবৌদি আবার সোমেশ্বরের বুকে মুখ ঘষে আদুরে গলায় বললেন, উঁউঁ, তুমি তো আলাদা। তোমার সঙ্গে কার তুলনা? তুমি তো দশরাত না ঘুমিয়েও খাড়া থাকতে পারো,—বাব্বা।

সোমেশ্বর হাসলেন—বললেন, থাক, তোমার আমার কথা এখন তোলা থাক, এবার বল তো পিঙ্কি ঠিকঠাক ঘুমিয়েছিল কি না? আমাদের যেমনই দেখাক—বাট পিঙ্কি মাস্ট লুক ফ্রেশ! অন্ততঃ রাজেশ যেন প্রথম দর্শনেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যায়।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার পিঙ্কি সেই কাল রাতে এসে শুয়েছে তো শুয়েইছে। এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে যখন উঠবে,—তখন দেখো, ঠিক তরতাজা গোলাপটির মতো দেখাবে তোমার বোনকে। আমি চানের ঘরে গরম জল-টল সব রেডি রাখতে বলেছি। ও উঠলেই চান করতে পাঠিয়ে দেবো।

রানীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল নলিনীপিসি তাকে গরম জলের কথা বলে রেখেছিলেন। রানী তাই ছটফট করে উঠল সোমেশ্বরের বুকের মধ্যে।

সোমেশ্বর বললেন, কি হল রানী ভাই? বেড-টি পাও নি?

সত্যি সোমেশ্বরের সব দিকে দৃষ্টি। রানী হেসে বলল, নলিনী পিসি কালই বারণ করে দিয়েছিলেন বেড-টি দিতে। কিন্তু আমি যাই সোমেশ্বরদা, নলিনীপিসির সকাল বেলায় বোধ হয় গরম জলের দরকার হতে পারে। —আমি যাই।

রানী তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল। পিছু ফিরে আর চাইল না। তার সারা শরীরে তখনো অস্বস্তির মতো— সোমেশ্বরের পরুষ ছোঁয়া।

পিছন থেকে মালতীবৌদি বললেন, রানী, ভাবনার কোন কারণ নেই। প্রচুর গরম জলের ব্যবস্থা আছে। তোমাদের কেবিনের সামনে যে বেয়ারাটি বসে আছে তাকে বোলো, সে এনে দেবে।

রানী সরু প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। পায়ের তলায় পুরু পশমি কার্পেট। তার ওপর দিয়ে দু'টাকার প্লাস্টিকের চটি পরে হেঁটে যেতে তার অদ্ভুত লাগছিল। দু'পাশে কাঠের দেওয়াল। দেয়ালে বার্ণিশ দেওয়া কারুকাজ করা কাঠের প্যানেল। দু'পাশে কিছুদূর অন্তর অন্তর জোড়ায় জোড়ায় আলো জ্বলছে।

রানী নিজের ভিতরে ভিতরে সন্তর্পণে ভাবল, তার মতো একটা অকিঞ্চিৎকর মেয়েকে এরা এখনো জাহাজ থেকে না ঠেলে ফেলে দিয়ে বরং যেন সমান সমান ভেবে কত আদর করছে।

রানী নিজের কেবিনে এসে স্লাইডিং-দরজা আস্তে খুলে উঁকি মেরে দেখল নলিনীপিসিকে। তখনো তিনি ঘুমোচ্ছেন। মাথায় লেশের ফ্রিল দেওয়া নাইট-ক্যাপ পরে তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। তাঁর শুকনো শক্ত মুখটি দিনের আলোয় বেশ অসুন্দর লাগছিল।

—রানী, ও রানী!

রেবতীপিসি পাশের কেবিন থেকে রানীকে ডাকলেন। রানী নিজের কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, দরজা ঠেলে রেবতীপিসির আধখোলা কেবিনে ঢুকল। পিশেমশাই ঘরে নেই। শুধু রেবতী পিসিই রয়েছেন।

রেবতীপিসিদের কেবিনটা অপেক্ষাকৃত বড়। দুটি বিছানার মাঝখানে ফিট করা ড্রয়ার-অলা টেবিল। তাতে মস্ত ট্রেতে ভুক্তাবশিষ্ট বেড-টির সরঞ্জাম আর লেমন জুসের জগ সাজানো। ট্রের ওপর লেশের টেবলক্লথ পাতা।

লেমন জুসের জগের ওপর রঙিন পুঁথির কাজ করা ঢাকনি। রেবতীপিসি বালিশে হেলান দিয়ে সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে গুটিশুটি হয়ে লেপের মধ্যে বসে, জানালা দিয়ে সাগরদ্বীপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর কেবিন রানীদের কেবিনের পাশে। আধখোলা দরজা দিয়ে তিনি রানীকে চলে যেতে দেখে ডেকেছিলেন।

রানীও ভাবছিল এই পিঙ্কি আব রাজেশের ব্যাপারটা রেবতী পিসি কিংবা নূপুরদিকে জিজ্ঞেস করবে। কারণ পিঙ্কি সম্ভবত সোমেশ্বরদার সেই বোনটি, যার আসার কথা ছিল। কিন্তু এই রাজেশটি কে? এ নাম তো সে আগে শোনে নি।

কিন্তু রেবতীপিসিকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই রেবতী পিসিই তাকে ডেকে বললেন, রানী, আয়! এখানে বোস একটু। একটা কথা শোন।

খুব চাপা গলায় কথা বলছিলেন রেবতীপিসি। যেন কত গোপন-কথা বলছেন।

—হ্যাঁ রে, নলিনী মানুষটা কেমন রে?

রানী অবাক হয়ে রেবতী পিসির দিকে তাকালো। নলিনী পিসি, রেবতীপিসির ছোটবেলার বন্ধু! তাহলে রেবতীপিসি কেন জানে না তার বন্ধু কেমন মানুষ?

রানী বলল, কেন? বেশ ভালো মানুষই তো!

—হ্যাঁ রে! স্মোক-টোক করে না তো?

রানী বলল, কৈ নাতো, দেখি নি তো!

রেবতীপিসির মাথায়, এই একা কেবিনেও চওড়া পাড়ের ঘোমটা টানা। সিঁথির দু'পাশের থাক্ থাক্ কাঁচাপাকা চুলের মাঝখানে

মোটা সিঁদুরের রেখা টানা চওড়া সিঁথি।

তিনি বিতৃষ্ণ গলায় বললেন, কথাবার্তা কেমন হলে রে?

—ভালোই তো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

কৌতূহলে রেবতীপিসির চোখ দুটি চক চক্ করে উঠল।

—কি কি গল্প করছিল?

—এই ওঁর বিদেশের গল্প। আমেরিকার, সুইডেনের—ওখানে উনি যে সব চাকরি-বাকরি করতেন সে-সবের কথা, ওখানকার জীবন, রীতিনীতি—

—ওর বিয়ের কথা বলে নি?

—না-তো!

—ওর দুটো বিয়ের কথা?

রানী নখ খুঁটতে খুঁটতে মাথা নেড়ে বলেছিল, না।

—আচ্ছা, ও এখনো ঘুমোচ্ছে? এত বেলা পর্যন্ত?

রানী যেন নলিনীপিসি খুব দোষ করে ফেলেছেন, এমনি নরম সুরে বলল, একামানুষ তো, হয়তো ওঁর একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো অভ্যেসই!

রেবতীপিসি ঠোঁট বাঁকালেন।

—কে জানে বাবা।

রানী উঠতে যাচ্ছিল, রেবতীপিসি হঠাৎ কেমন যেন ভেঙে পড়ে বললেন, জানিস রানী, অথচ আমি কত কি-ই না ভেবেছিলাম। নলিনী হঠাৎ দশ বছর বাদে টেলিগ্রাম করে জানালো, আমি আসছি, আমি তোমার কাছেই থাকব, আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল। বাতের ব্যথায় কাতরাচ্ছি আর নলিনীর জন্যে ঘর সাজাচ্ছি। কোথায় আর যাবেই বা? অগাধ টাকা। রাখবার জায়গা নেই। কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজন বলতে তো তেমন কেউ নেই। মেসোমশাই মাসিমা তো কবেই চলে গেছেন! কাল তোর পিশেমশায়কে পাঠালাম এয়ারপোর্টে নলিনীকে আনতে। আমি বসে রইলাম

বাড়িতে। ওকে বিসিভ করব বলে। কিন্তু ও কে এলো? ছাঁটা চুল, এনামেল করা লম্বা লম্বা নখ; পরণে হাল্কা শিফন, হাই-হিল স্টীলেটো। ঠোঁটে গালে রঙ। ও কি আমার সেই নলিনী? আর নলিনীও সিঁড়ি দিয়ে উঠে কি অদ্ভুত ভাবে দেখছিল আমাকে। যেন জীবনে প্রথম দেখছে। যেন সম্পূর্ণ একটা অচেনা মানুষ আমি! রানী রে,—আমি জীবনে কখনো এত কষ্ট পাই নি, রানি রে। তাইতো ও যখন খেতে বসে বলল ভারতদর্শন করতে যাব, আমি সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালাম তোকে। আমার সব স্বপ্ন, সব ধাবনা ভেঙে যাবার আগে, যাতে আমি ওকে তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে দিতে পারি! কত আদর করে ওর নাম দিয়েছিলাম লীনা।

রানী উঠে পড়ল। সে দেখল রেবতীপিসির চোখে গভীর হতাশার ছাযা ঢুলে ঢুলে উঠছে।

—তা হ্যাঁ রে রানী, সত্যি ও স্মোক করে না? আমি কিন্তু ওর দু-আঙুলের ফাঁকে হলদে দাগ দেখেছি।

রানী বুঝতে পারছিল রেবতীপিসি কতখানি অস্বস্তিতে ভুগছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার আর কি ভূমিকা থাকতে পারে? চাপা উদাস গলায় সে বলল, আমি যাই, নলিনীপিসি উঠেই হয়তো গরম জল চাইবেন।

রেবতীপিসি জানালা দিয়ে সাগর দ্বীপের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন। কেবিনের দরজা সরিয়ে রানী বাইরে বেরিয়ে এলো।

সামনেই সুহাসদা আর নূপুরদি।

সুহাসদা একহাতে নূপুরদিকে জড়িয়ে ধরে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কি যেন বলতে বলতে আসছিল। যেন ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। দুটি বন্ধু ভারী সুন্দর মানিয়েছিল দুজনকে। নূপুরদি একটা দামী কালো শিফন পরেছে। তার ওপর রোমশ কালো পশমের কার্ডিগান। কার্ডিগানের আগাগোড়া বোতাম আঁটা। নূপুরদির সুন্দর ফিগারটি

যেন ফুটে ফুটে উঠেছে। দুরন্ত লাগছে নূপুরদিকে। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেছে চুল। পাকা গমের মতো রঙের মুখে পরিশ্রমের সিঁদুরে আভা। সুহাসদাও 'চারকোল-গ্রে' ট্রাউজারের ওপর গাঢ় ছাই রঙের কার্ডিগান পরেছে। গলায় লাল কালো সাদার চেক চেক মাফলার। চুলগুলি হাওয়ায় ওলোট-পালোট।

রাণীকে দেখে সুহাস হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ইসস্ রানী, তুমি যে কি সব দারুণ দারুণ ব্যাপার মিস্ করলে! আমরা দুজন রাত থাকতে উঠে ফেরিনৌকোয় চড়ে সাগরদ্বীপে গিয়ে কত ঘুরে এলাম। ঘাড়ে চা খেলাম। গরম গরম জিলিপি!

রানী নূপুরদির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, নূপুরদি, পিঙ্কি কে গো?

নূপুরদি আর সুহাসদা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন রানী খুব একটা হাসির কথা বলে ফেলেছে।

—আরে, পিঙ্কিই তো সব! সোমেশ্বরদার সাগরে আমার স্পেশাল এই ব্যবস্থার কারণটাই তো পিঙ্কি।

নূপুরদি হাসতে হাসতে বলল, পিঙ্কি হল সোমেশ্বরদার দারুণ প্রিয় মামাতো বোন। শুনেছি বিশাল ধনীর একমাত্র মেয়ে।

রানী আবার জিজ্ঞেস করল, রাজেশ কে?

—আর্কিটেক্ট! পিঙ্কির সঙ্গে ওর বিয়ে হবার কথা। ওদের দুজনকে রোমান্টিক একটা এ্যাটমসফিয়ারে মেলানোর জন্যে এত কাণ্ড কারখানা। অবশ্য তা ছাড়াও সোমেশ্বরদার একটা 'নতুন দ্বীপ' নিয়েও কি সব প্ল্যান-ট্যান আছে। সোমেশ্বরদা সে-সব ব্যাপারেও রাজেশের সঙ্গে কনসাল্ট করে নেবে!

সুহাসদা মাথা হেলিয়ে হেসে বললেন, একেবারে মাল্টি-চ্যানেল লোক, তাই না নূপুর! সোমেশ্বরদার মাথায় যে একসঙ্গে কত কিছু খেলে!

নূপুরদি হেসে বলল, কিন্তু রাজেশরা তো এখনো এলো না।

ওদের তো আজ ভোরেই এসে যাবার কথা। রাজেশরা লঞ্চে আসছে না ?

সুহাসদা বললেন, হ্যাঁ, ওদের আরো মজা। সিধে বাঁধাঘাট থেকে আসছে ওরা।

রাণীর হঠাৎ নলিনীপিসির গরম জলের কথা মনে পড়ে গেল। নূপুরদি আর সুহাসদাদের পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি নাচে লঞ্চের খোলের মধ্যে নেমে গেল রানী।

নীচে বিরাট প্রশস্ত কিচেনে সার সার কুক আর বেয়ারারা কাজ করছে। রানী একটা লাল প্লাস্টিকের বালতিতে আধবালতি গরম জল ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেয়ারারা কেউ রানীকে দেখতে পায় নি। তাহলে হয়তো রানীর হাত থেকে বালতিটা কেড়েই নিত।

গাছ-কোমর বেঁধে বালতিটা নিয়ে উঠতে উঠতেই রানী একটা ধক্ ধক্ শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা ক্রমশ তাদের লঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। রানী উঠে একহাতে বালতিটা ঝুলিয়ে, ঈষৎ বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একটা ধবধবে সাদা অনাড়ম্বর লঞ্চ দ্রুত এগিয়ে আসছে 'রাজেন্দ্রাণীর' দিকে। রানী এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে লঞ্চটির গায়ে হাল্কা নীল দিয়ে লেখা নামটি পড়বার চেষ্টা করল।

'স্বাগত !'. বাঃ ভারি সুন্দর নামটি তো ! লঞ্চ থেকেও কয়েকজন যুবক ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে ছিল 'রাজেন্দ্রাণী'র দিকে। 'রাজেন্দ্রাণী'র গায়ে গা লাগবার আগেই একটি লম্বা ছিপছিপে যুবক লাফিয়ে পড়ল রাজেন্দ্রাণীর ডেকে। রানী লক্ষ্যই করে নি ওদিকের সিঁড়ি থেকে সোমেশ্বরদা আর মালতী বৌদি দ্রুত নেমে আসছেন। যুবকটি তখন একেবারে রানীর সামনাসামনি। উদ্দীপনায় তার চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করছে। ভারী নিবিড় কালো উজ্জ্বল দুটি চোখ। রানীকে দেখে বলল, বাঈ, সোমেশ্বরদা ঘুম থেকে উঠেছে ?

রানী যুবকটির কথা ধরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের সিঁড়ি

দিয়ে দ্রুত নেমে এসে সোমেশ্বরদা তার কথাটা প্রায় চাপা দেবার জন্যেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, রাজেশ, এসে গেছ! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। রানী। আমাদের 'রাজেন্দ্রাণী'র অনারেবল্ গেস্ট। সুহাস, সুহাস সরকার, আমাদের সুখাপুখুরিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সুহাসের সুন্দরী শ্যালিকা!

মালতীবৌদিও প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, ভারী লক্ষ্মী মেয়ে! পরে আলাপ হবে!—এসো রাজেশ, ওপরে এসো।

রাজেশ অপ্রস্তুত হয়ে কোনমতে হাতজোড় করে একটা শুকনো নমস্কার জানিয়ে, রানীর পাশ দিয়ে সোমেশ্বরের দিকে উঠে গেল। মালতীবৌদি পিছন ফিরে সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে রানীকে বললেন, তোমায় এত করে বললাম রানী তুমি যা দরকার ঘরের সামনের বেয়ারাকে বলবে। দু'দিন আরাম করতে এসে খামোখা এত কষ্ট করছ কেন ভাই?

রানী বালতিটা নিয়ে ওই ভাবেই ঈষৎ বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুহাস সরকারের সুন্দরী শ্যালিকা! হাঃ! ...রানীর পাশ দিয়ে দুটি যুবক ওপরে চলে গেল। দুজনেই আড়চোখে রানীর দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক দেখে গেল। একটি কালো লম্বা যুবক এমন ভাবে রানীর দিকে তাকিয়ে গেল যে রানী হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বালতিটা নিয়ে রানী তাড়াতাড়ি নিজেদের কেবিনের দিকে চলল। তার কানে সোমেশ্বরের কথাটা একটা ঠাট্টার মতো বাজতে লাগল। সুহাসের সুন্দরী শ্যালিকা। সোমেশ্বরদা বেশ বানিয়ে ম্যানেজ দিতে পারেন তো! 'বাঈ' শব্দটা ভারতের কোথাও যে দাসীদেরও উদ্দেশ্য করে বলা হয় তা যেন রানী জানে না! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের হিজিবিজি চুলগুলো সরাতে সরাতে রানী একা একাই একটু হাসল, তারপর তার চোখ উপচে জল এলো। জলের বালতিটা নিয়ে সে যখন প্রায় কেবিনের দরজায় এসে গেছে তখন

উল্টোদিক থেকে ছুটতে ছুটতে একজন বেয়ারা শশব্যস্তে উঠে এসে রানীর হাত থেকে জলের বালতিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে কেবিনে ঢুকল। বোধ হয় মালতীবৌদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রানী তার পিছন পিছন কেবিনে ঢুকল। নলিনীপিসি আধশোয়া হয়ে বসে ছিলেন। রানীকে দেখে যেন স্বস্তি পেলেন।

রানী বলল, আপনাকে বাথরুমে গরম জল দিয়েছে বেয়ারা।

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পর নলিনীপিসি উঠলেন।

রানী বলল, এতেই হবে তো না আরো আনতে বলব?

নলিনীপিসি বললেন, না না আর চাই না। আপাততঃ হাত মুখ ধোয়া তো, এতেই হয়ে যাবে। আসলে আমার কোল্ড এ্যালার্জি তো। ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট পাই। ওদেশে তো ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট থাকে। তাতে খানিকটা আরাম। এখানে দেখছি ঠাণ্ডায় পা কোমর সব ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। নলিনীপিসি বাথরুমে যেতে রানী আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। দেয়ালে সোনালী ফ্রেম লাগানো আয়না[illegible] ভাব ছবি। নাঃ, রাজেশের কোন দোষ নেই। রোগা শ্যামলা একটা পাঁচ পাঁচি বাঙালী মেয়ে। বড্ড সাধারণ। চিরুনীটা [illegible] রানী সিঁথির দু'পাশের চুলগুলো সিধে করে [illegible]। আর [illegible] দরজা [illegible] ঢুকল। এর মধ্যে নলিনীপিসি [illegible] মস্ত একটা সেলাম [illegible] ডাকছেন মেমসাব।

রানী একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, তবে [illegible] খাবার [illegible]। কে?

—উনি ঘরেই চাইলেন।

রানী বলল, বেশ, তাহলে আমিও ঘরেই খাব।

—তাহলে আপনার ব্রেকফাস্ট-টা এনে দি।

রানী স্তূপাকার খাবারের দিকে তাকিয়ে বলল, না, দরকার নেই। এতেই হবে!

বেয়ারা চলে যাবার পর নলিনীপিসি বেরোলেন। রানী তখন দুটো হট-ওয়াটার ব্যাগ গরমজল ভরে দিয়ে নলিনীপিসির বিছানায় রেখেছে। নলিনীপিসি বোধ হয় রানীর আর বেয়ারার কথোপকথন শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, রানী, যাও না, তোমাকে ওঁরা ডইনিং রুমে ডাকছেন!

রানী বলল, না, না, আপনি একা একা চা খাবেন তাও কি হয়?

নলিনীপিসি কৃতজ্ঞ হাসি হাসলেন। তারপর বিছানায় বসলেন। রানী চায়ের কেৎলির ওপর পরানো কাশ্মিরী কাজ করা ঢাকনাটা তুলে চা ঢালতে লাগল পেয়ালায়। ট্রেতে স্তূপাকার টোস্ট জ্যাম-জেলি, মাখনের বাটিতে টাটকা মাখন। প্লেটে আঙুরের থোকা, কমলা লেবু আপেল কলা। জ্যাম মার্মালেড্ জেলি,—নতুন গুড়ের সন্দেশ, সালামি দেওয়া পাতলা স্যাণ্ডুইচ, কর্ণফ্লেক্স, গরম দুধ!

রানীর হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে নলিনীপিসি বললেন, আঃ, সকালটাই সুন্দর হয়ে গেল রানী। কত দিন যে আমাকে কেউ এমন করে চা বানিয়ে দেয় নি!

রানী হেসে বলল, ওখানে সব নিজে নিজে করতেন?

—হ্যাঁ! সকালে ঘুম থেকে উঠেই ইলেকট্রিক ওভেনে গরম জলের কেৎলি বসিয়ে দিতাম দুটো ডিমসেদ্ধ আর কিছু রুটি খেয়ে কালো কফি গিলে বেরিয়ে পড়তাম কাজে। বাসে দু'ঘণ্টার জার্ণি।

খাবারের স্তূপের দিকে তাকিয়ে নলিনীপিসি বললেন, এরা কি মালটিমিলিওনেয়ার?

রানী ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে?

কিন্তু আসলে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। সত্যি এরা এত ধনী! মানুষ আবার এত ধনীও হয়?

মুচমুচে টোস্ট চিবোতে চিবোতে অতি সঙ্গোপনে কিন্তু রানীর খুব ইচ্ছে করছিল যে ডাইনিং রুমে যায়। কিন্তু নলিনীপিসিকে

একা একা রেখে চা খাবার কথা রানী ভাবতেও পারে না। হয়তো নলিনীপিসির 'ওদেশে', মেয়েরা, মানে হায়ার্ড সঙ্গিনীরা বুড়িদের সঙ্গে একসঙ্গে চা খাবার জন্যেও পয়সা পায়।

নলিনীপিসী আবার বললেন, রানী, তুমি কিন্তু ডাইনিং রুমে গেলে পারতে। ওখানে তোমার সমবয়সী সব ছেলেমেয়েরা আছে। ওখানে তোমার বেশী ভালো লাগত!

রানী বলল, আপনার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগছে নলিনীপিসি!

চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ঠেকিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে নলিনীপিসি বললেন, এই যে ছোট্ট কথাটি তুমি বললে রানী, এমনি কথা শোনবার জন্যেই আবার আমার এদেশে ফেরা। ওদেশে এমন দরদ করে কথাও কেউ বলে না।

রানী জিজ্ঞাসু নেত্রে নলিনীপিসির দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি টোস্টে মাখন মাখিয়ে রানীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমেরিকায় যাবার পর আমার প্রথমবার বিয়ে হয়। আমার প্রথম স্বামী বেশ কয়েক বছর সুইডেনে আর্কিটেক্ট-এর কাজ নিয়েছিলেন। সে সময় আমরা যে বাড়িতে থাকতাম সে বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের একটা কুকুর ছিল। কুকুরটি একদিন সামান্য চেঁচামেচি করাতে পাড়াপড়শির কমপ্লেনে তাকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল।

—চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া? রানী খুব অবাক হয়ে তাকালো।

- ঘুম পাড়ানো মানে ওকে বিষ ইঞ্জেকসন দিয়ে মেরে ফেলা, এই আর কী?

রানী ভয়ে আতঙ্কে অল্প কেঁপে উঠল।

- সাত্যি নলিনীপিসি, এমনি সব ঘটনা হয়?

-হয় না? শুনবে? আমার স্বামী সারাদিন কাজে ব্যস্ত

থাকতেন বলে নিজেকে এনগেজ্ড রাখার জন্যে আমি একটা ওল্ড হোমে কাজ নিয়েছিলাম। সেখানে বুড়ো মানুষদের দেখা শুনো করতে হত হপ্তায় দু-তিনদিন।

রানা প্রশ্ন করেছিল, ওল্ড হোম মানে অনাথ-আশ্রম?

—না, অনাথ কেন হবে ওরা। ওদের ছেলে-পুলে নাতি-নাতনি আত্মীয়-স্বজন সবই আছে। তবে বার্ধক্যকে ওরা একটা রোগ বলেই ধরে। স্বাভাবিক পরিবারে বার্ধক্যপীড়িত লোককে ওরা রাখে না। রাখতে চায়ও না। তাই আলাদা করে দেওয়ার ব্যবস্থা।

কি সুন্দর সেই সব ওল্ড হোমগুলো। টি. ভি, প্রজেক্টর, এয়ার কণ্ডিশন, সেণ্ট্রাল হিটিং, লাইব্রেরী, লিফ্‌ট, মেসিওর—ভালো খাওয়া দাওয়া—বিলাস আরামের সমস্ত রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা। অথচ বুড়ো মানুষগুলো, আত্মীয়-স্বজন দূরে থাক, আমরা কখন যাব, সেজন্যে হন্যে হয়ে থাকত। একটু হিউম্যান টাচ এমন জিনিস!

একটু হিউম্যান টাচ—আঃ! রানী জানে। রানী জানে। একটু হিউম্যান টাচ কি জিনিস, আর তার অভাবই বা কি প্রচণ্ড প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারে। নলিনীপিসির সামনে বসে থাকতে থাকতে, মনে মনে রানী উঠে গেল। রানী উঠে গিয়ে তার ছেঁড়া ব্যাগটাকে পাগলের মতো ঝাড়তে চাইল! যদি কোন অদ্ভুত ইন্দ্রজালে আবার তার ঘুমের বড়ির শিশিটা ফিরে আসে।

রানী যখন আবার নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এলো তখন শুনল থেকে থেকে নলিনীপিসি বলেই চলেছেন, একবার একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা দেখেছিলাম। জানো রানী। আমার মনে ঘটনাটা খুব গভীর দাগ কেটেছিল।

একবার এক থুত্থুড়ে বুড়ো। পঁচানব্বই বছর বয়স বোধ হয়। আমি তার খুব বন্ধু হয়ে পড়েছিলাম বলে আমাকে খুব সন্তর্পণে বলেছিল,—জানো, কাল আমার নাইন্টিসিক্সথ্ বার্থডে। কাল তুমি এসো। কালকে ঠিক আমার ছেলে-মেয়েরা আসবে।

পরদিন উপহার-টুপহার নিয়ে তো আমি গেলাম। কি যত্ন করে সাজগোজ করেছে বুড়ো। আমার কাছ থেকে উপহার পেয়ে কি খুশি। আমি চেয়ার-গাড়িতে বসিয়ে বুড়োকে দোতলার লাউঞ্জে নিয়ে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলাম বুড়োর সঙ্গে। তারপর গাড়িশুদ্ধ লিফটে উঠিয়ে বুড়োকে একতলার লাউঞ্জে নিয়ে. গেলাম। সেখান থেকে এগিয়ে বড় হলঘরে, রিসেপসন রুমে—তারপব বাগানে। বাগান পেরিয়ে একেবারে গেটের কাছে। ক্রমশ সন্ধ্যে হয়ে এলো। হিম পড়তে লাগল। ভয়ংকর শীত ওখানে। বুড়োর ফার কলার দেওয়া চামড়ার ওভারকোটের ওপর ভালো করে মাফলাব পেঁচিয়ে দিলাম। দু-একবার বলবাবও চেষ্টা করলাম ঠাণ্ডা পড়ছে, এবার ঘরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কোন কথাই যেন মুখ দিয়ে বেরোল না আমার। দেখলাম বুড়ো জুলজুল করে রাস্তার বাঁকেব দিকে তাকিয়ে আছে। তার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিদের জন্যে। কেউই শেষ পর্যন্ত এলো না। বুড়ো তখন আপনা থেকেই বলল, চল, ঘরে যাই।

অবশ্য হোমেব বুড়ো বুড়িদের কেউ কেউ বুড়োকে ছাড়ে নি। সোজা কথা। ছিয়ানববইটা বাতি জ্বেলে কেক্ কাটা। ওঃ বানী আজও মনে পড়ে সেই বুড়ো বুড়ো গ্রোটেস্ক মুখগুলো। সেই দুঃখী, লোভী, কুঁচকে ওঠা চামড়ার মানুষগুলো

মনে আছে, সেদিন ডিউটি আওয়ার্স পেরিয়ে যাবাব পরও আমি বাড়ি ফিরতে পারি নি। ওদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলাম।

ম্যাক্স সেদিনই প্রথম আমার ওপর বেশ বিরক্ত হয়। আমার এই সব ইমোশনাল কাণ্ডকারখানা ও ঠিক পছন্দ করত না। এই ধরণের আরো নানান্ ঘটনায় ও ক্রমশ আমার ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত খুব শান্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায়, অনেক হিশেব করে, ভেবে চিন্তে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। ম্যাক্স বড় মানুষ ছিল। ও আমাকে এ্যালিমনি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি নিই নি।

ও শেষ দিনও আমায় বলেছিল, নলিনী, তুমি বড্ড ইমোশনাল। টাকাটা নিলে না কেন ?

আমি বলেছিলাম,—কি হবে, আমার তো কোন লায়াবিলিটি নেই। ছেলে পুলে ! তাছাড়া আমার টাকার দরকার নেই। আমার অনেক আছে !

রানী অবাক হয়ে শুনছিল, তারপর আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ, আমি কিছু দিন সুইডেনে কাটিয়ে আমেরিকায় ফিরে এলাম। ম্যাক্স ওখানেই রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ও সুইডিশ সিটিজেনশিপ নিয়ে নিল। ওর যে সেক্রেটারী ছিল—তার নাম থোরা, তাকে নিয়েই রয়ে গেল। সে মেয়েটিও সুইডিশ !

—বিয়ে হল বুঝি ?

—না, না, ওরা তো বিয়ে করে না। ওদেশে এখন আর বিয়ে-টিয়ে তেমন নেই। আর বিয়ে-টিয়ে নেই বলেই তেমন ছাড়াছাড়িও নেই। ওরা বেশির ভাগই আজীবন একসঙ্গে থেকে যায়। আমি যদ্দূর জানতাম ম্যাক্স সেই থোরা মেয়েটির সঙ্গেই ছিল।

রানী অবাক হয়ে শুনছিল। কেমন যেন লাগছিল তার। দূর বিদেশে, সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে একটি বাঙালী মেয়ে একা তার ফ্ল্যাটে নিজের ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে—একা একা ঘুরছে। রানী নলিনীপিসির মুখের রেখায় রেখায় সেই সব ঝড় ঝাপটা একাকীত্বের ফাটল দেখতে পেল। কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের রেখা-জাল। হঠাৎ রানী বলে উঠল, আচ্ছা নলিনীপিসি, আপনার কখনো স্যুইসাইড করতে ইচ্ছে হয় নি ?

নলিনীপিসি চকিতে তাকালেন তার দিকে। যেন অদ্ভুত একটা গোপন সঙ্কেত রানী জেনে ফেলেছে। রানীও অবাক হয়ে তাকাল নলিনীপিসির দিকে। তবে কি নলিনীপিসি তার সেই ঘুমের বড়ি-ভরা লম্বা শিশিটার কথা জেনে ফেলেছেন ? তবে কি নলিনী-

পিসির ঘরেই…?

নলিনীপিসি বললেন, স্যুইসাইড! জানো রানী…

তাঁর কথার মাঝখানেই দরজায় নক্ করল কেউ। তারপর বাইরে থেকে অজিতপিশেমশায়ের গলা শোনা গেল, আসতে পারি?

রানী উঠে দরজা খুলে বলল, আসুন!

বাইরে রেবতীপিসি আর অজিতপিশেমশাই। সকালবেলাই টিপটপ। সাজাগোজা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যেন মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছেন। নলিনীপিসি উঠে বসে বললেন, আরে আসুন আসুন, —এসো এসো! রানী কেবিনের কোণে রাখা দুটো 'পুফে' এগিয়ে দিল। খানিকক্ষণ বসে বসে তাদের দেশের মতো আড়ষ্ট কৃত্রিম কথাবার্তাও কিছুটা শুনল। তারপর খুব বিস্বাদ লাগতে এঁদের সবার অলক্ষ্যেই সে ছুটে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর তখনই তার যার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তার নাম কেউ না বলে দিলেও রানী ঠিক বুঝতে পারত। সে হল, পিঙ্কি।

রানী জীবনে কখনো এত চমৎকার ডল পুতুল দেখে নি। পিঙ্কিও তার অবাক দুটি চোখে রানীকে দেখছিল। সমবয়সী হলেও দেখতে পিঙ্কিকে অনেক ছোট মনে হয়। কিন্তু কি যে মোলায়েম, কি যে আনকোরা নতুন চেহারা। মানুষের শরীরে স্বাভাবিকভাবে এত রকম সুন্দর সুন্দর রঙ থাকতে পারে তা কি রানী আগে কখনো জানতো? পিঙ্কি যেমন অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছিল, রানীও তেমনি অবাক হয়ে পিঙ্কিকে দেখছিল।

পিঙ্কি বলল, ও, তাহলে তুমিই নূপুবদির বোন? তা ডাইনিং রুমে যাও নি কেন? সকালবেলা বৌদি বলছিলেন তোমার সমবয়সী একটি মেয়ে এই লঞ্চে আছে, বেশ গল্প করে কাটাতে পারবে, বোর লাগবে না!

রানী বলল, পিঙ্কি তুমি কী সুন্দর!

—বোল না তো? সব সময় এই কথাটা শুনতে শুনতে আমার

একেবারে মাথা ধরে গেল। চল, সাগরদ্বীপে নামবে না? সুহাসদা আর নূপুরদি গরম গরম জিলিপি খেয়ে এসেছে, আমরাও খাব। কি মজা না? দ্বীপের বালিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা করে খাওয়া!

রানী মুগ্ধ, সম্মোহিত চোখে পিঙ্কির দিকে তাকিয়ে তার কথা বলা দেখছিল।

—কই, যাও, সেজেগুজে এসো!

পিঙ্কি হাসল। রানী একটু একটু করে পিছিয়ে পিঙ্কির চোখে চোখ রেখে নিজেদের কেবিনে ঢুকতে যাবে হঠাৎ প্যাসেজ থেকে তাকে নূপুরদি ডাকল। রানী কোনমতে পিঙ্কিকে, 'আসছি' বলে নূপুরদির পিছন পিছন গেল।

নিজেদের কেবিনে রানীকে নিয়ে গিয়ে নূপুরদি বলল, রানী, তোর সঙ্গে কি কি রঙের ব্লাউজ আছে রে? নে আমার স্যুটকেশ দুটো খুলে রঙ মিশিয়ে ক'টা শাড়ি বেছে নে। কি যে ভূত হয়ে থাকিস— একটু সাজগোজ কর তো? সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদি যে কী মনে করছে!

রানী শাড়ির স্যুটকেশ দুটো নামিয়ে বাছতে বসল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, নূপুরদি পৃথিবী 'ক ধ্বংস-টংস হয়ে যাচ্ছে?

নূপুরদি দেওয়ালে ল্যাপটানো লম্বা আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল, কেন রে?

—বাব্বা, তুমি তো দেখছি 'নোয়ার আকে' থাকবার জন্যে একেবারে বছর খানেকের মতো শাড়ি এনেছ!

নূপুরদি আয়না দিয়ে রানীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আহাঃ, বুঝিস না কেন, থাকি তো সুখাপুখুরিয়ার মতো একটা জনমানবশূন্য শুকনো জায়গায়। ওখানে তো শাড়িগুলো আলমারি বাক্সেই পচে। কাকে আর দেখাবার জন্যে পরব। এখানে যখন একটু চান্স পেয়ে গেছি তখন · বল রানী, জীবনে কখনো এ রকম লাক্সারি লঞ্চ দেখেছিস?

রানী হেসে বলল, এখানে এসে এই একদিনেই বুঝতে পারছি নূপুরদি আমি জীবনে অনেক কম দেখেছি। নূপুরদি ফিরে তাকিয়ে অদ্ভুত সুরে বলল, কোন কোন ব্যাপারে, জীবনে যত কম দেখা যায় ততই ভালো।

—কোন্ কোন ব্যাপারে?

নূপুরদি কিছু বলল না। রানী দেখল আয়নার নূপুরদি বিনুনি করতে করতে হাসছে। নূপুরদিটা কিন্তু দেখতে ফাইন। কি চমৎকার পুরন্ত ফিগার। থল্‌থলে নয়। একেবারে সলিড। হবে না। কুমারী কালে দারুণ ভালো এ্যাথলিট ছিল. সুন্দর সাঁতার কাটত। সাঁতারে চ্যাম্পিয়ানও ছিল যেন। আয়নার নূপুরদির হাসি দেখতে দেখতে রানী হঠাৎ বলল, আচ্ছা নূপুরদি 'আর' কে?

নূপুরদি বলল, কেন? তুই? তুই না রানী। তোর তো নামের প্রথম অক্ষর 'আর' তাই না?

—আহাঃ, তুমি যেন আমার নামে রুমাল বানিয়ে রেখেছিলে। যত বাজে কথা।

হঠাৎ চমকে উঠল রানী। তার মনে পড়ল সে নূপুরদির অত যত্নে কারুকাজ করা একখানা রুমাল তো হাতে নিয়েই ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন ফেলে দিয়েছে। গাড়িতে? জেটিতে? লঞ্চের কোথাও? কেবিনে?

রানী ছট্‌ফট্ করে উঠে দাঁড়াল। আঃ, অমন একখানা রুমাল! নূপুরদির সেলাই করা. সেই 'সুখচ্ছবি'র বাক্সে জমিয়ে রাখা একটা চারকোণা নয়ন-সুকের রুমালের জন্য রানীর মনটা হু হু করে উঠল। সে ছুটে বেরিয়ে সারা লঞ্চে রুমালটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। আশ্চর্য,—রানী কালই তার পুরো জীবনটাই ফেলে দিতে চেয়েছিল। এবং এখনও চায়। তবু কি আশ্চর্য, একটা রুমালের জন্যে তার বুকের খচখচানি কিছুতেই কাটছিল না।

খুঁজতে খুঁজতে রানী আবার চলে এলো লঞ্চের পুবদিকে। কি

আশ্চর্য সুন্দর বিলাস-তরণী এই 'রাজেন্দ্রাণী'। এমন সুসজ্জিত আধুনিক সব পেয়েছি জলযান কখনো হতে পারে রানী জানত না। রোদ্দুরে ঝলমল ডেকে দাঁড়িয়ে রানী নীচু হয়ে দেখতে লাগল। কোথায় যে গেল রুমালটা? মাত্র চারটে রুমাল। সেই কবে কুমারীবেলায় নূপুরদি তৈরি করেছিল কে জানে? কার জন্যে তৈরি করেছিল তাই বা কে জানে। কিন্তু হারিয়ে যাবে কেন? অত সুন্দর স্বচ্ছ কারুকাজ করা, শাদা ফুলের মতো ফুরফুরে জিনিস! হারিয়ে যাবে? কেন হারিয়ে যাবে?

রানীকে কখনো তো কেউ কিছু দেয় নি। তাই রানী যেটুকু পায় সেটুকু কিছুতেই হারাতে চায় না।

কি আশ্চর্য না? এই নিজেকে এবং নিজের অচেনা মনকে বুঝতে চাওয়ার ইচ্ছে, বুঝতে পারার বোধ। রেলিঙ ধরে জলের দিকে তাকিয়ে আপন মনে হেসে উঠল রানী।

আবার কি রানী বোকার মতো ওয়েটিং রুমে সংসার পাতার আয়োজন করবে? আজকের এই দিনটি রানীর জীবনে বাড়তি. এই দিনটি আসারই কথা নয়। তবু যদি তার অনিচ্ছা সত্বেও দিনটি এসে গেল, তখন তার তো সব কিছুকেই নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করা উচিত। সে কেন এত মুগ্ধ, বিগলিত, দুঃখিত, আনন্দিত, অপমানিত হবার জন্যে নরম করে রাখছে তার মনকে। ভাঙাখোলা শামুকের মতো অনাবৃত?

তার তো দূর থেকেই সবকিছু দেখা উচিত নির্লিপ্তের মতো। দূরের মানুষের মতো। পৃথিবীর অতিথির মতো। এখন কিনা সে একটুকরো 'নয়ন-সুকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে!

—আমি কিন্তু কিছুই হারাতে চাই নি। রানী কথাটা নিঃশব্দে হাওয়ায় ছেড়ে দিল।

হারাতে চায় নি বলেই, ছোটবেলায় মা আর বাবাকে হারিয়ে ফেলল। পরের করুণায়, দয়ায়, তাচ্ছিল্যে মানুষ হল করুণাহীন

শস্তা হোস্টেলে হোস্টেলে। আত্মীয়-স্বজন যা দু-চারজন আছে, তাদের কারো কারো ইচ্ছে হলে, শখ হলে, তাকে দেখাশোনা করে। কিন্তু সবাই তাকে তফাতে রাখে। যেমন রেবতীপিসি! রানী তাঁর বাড়িতে থাকতে গেলে জায়গা দেন। কিন্তু গেস্ট রুম খুলে দেন। নিজের মেয়ের ঘরটা কখনো খোলেন না।

হঠাৎ চোখ তুলে রানী পাশের কেবিনের জানালা দিয়ে দেখতে পেল স্নহাসদা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। আর সহাস্য চোখে রানীকে দেখছেন আয়নার ভিতর দিয়ে। রানীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্নহাসদা হেসে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

—কি রানী? ভয় করছে?

—কেন?

—যদি সেই কথাটা বলে দিই!

রানী একটু ভুরু তুলে বলল, করছে বই কি!

স্নহাসদা হেসে বললেন, না বলি নি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। নূপুর শুনলে তোমায় খুব বকত।

রানী নিষ্ঠুরকণ্ঠে বলল, নূপুরদি বকত না, কারণ আমি তো ওর নিজের বোন নই। তবে আমার আশ্রয়টা যেত।

স্নহাসদা বললেন, চল, ছেলেমানুষী করে মন খারাপ কোরো না। সাগরদ্বীপ দেখতে চল। মন ভালো হয়ে যাবে। মনে কোরো না কেবল লঞ্চেই সোমেশ্বরদার এলাহী আয়োজন। দ্বীপেও মস্ত টেন্ট পড়েছে। চল!

—চলুন!

কাঁধ ঝাঁকানি দিল রানী। তারপর অদ্ভুত সুরে বলল, তবে এখন ইচ্ছে করলে আপনি নূপুরদিকে যা ইচ্ছে বলতে পারেন স্নহাসদা। আমার আর কিছু আসে যায় না। কারণ আমার আর কোন আশ্রয়ের দরকার হবে না ভবিষ্যতে!

রানীর কথা শুনেও স্নহাসদা কিন্তু হাসছিলেন। একটু তাচ্ছিল্য

মেশানো প্রশ্রয়ের হাসি। চাপা রহস্যময় কণ্ঠে তিনি বললেন, রানী, সেই ছেলেটিকে তুমি এখনো খুব ভালোবাসো, না?

রানী চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, কোন রকম ভালোবাসা বা না বাসায় আমার এখন সত্যিই আর কিছুই আসে যায় না সুহাসদা। আপনি বিশ্বাস করুন! শুধু একটা বিষয়ে আজ আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি, আর কোন দিন, জীবনে কখনো আপনার কাছে ও ভাবে ছুটে গিয়ে, আপনাকে আর বিব্রত করব না।

সুহাসদা হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, কেন রানী? এখন বুঝি বিব্রত করার জন্যে আরো অনেক সুহাসদা জুটে গেছে তোমার?

রানী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল সুহাসদার চোখ দুটো তীব্র আক্রোশে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে! তিনি অদ্ভুত ঘৃণায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই জন্যেই তোমাদের, মেয়েদের আমি এত ঘৃণা করি! কথাটা বলেই রানীর পাশ দিয়ে নেমে চলে গেলেন সুহাসদা।

রানী রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখল 'রাজেন্দ্রাণী' থেকে ছোট ছোট বোট রওনা হচ্ছে সাগরদ্বীপের দিকে। প্রথম বোটে চলে যাচ্ছেন নলিনীপিসি, রেবতীপিসি আর অজিতপিশেমশাই। দ্বিতীয় বোটে উঠলেন সুহাসদা আর নূপুরদি।

ওই বোট দুটো ফিরে এলে তারপর হয়তো রানীর যাওয়ার ব্যবস্থা।

রানী নীচে নেমে দাঁড়াল। তার মনে হল সঙ্গে কিছু পয়সা আর একটা ছোট চিরুনী নিয়ে গেলে ভালো হত।

কিন্তু তার হ্যাণ্ডব্যাগটা তো একদমই অকেজো। আর নূপুরদির দেওয়া ওই সৌখীন পুরোনো রুমালগুলো এত বেশি সৌখীন যে পয়সার ভার সইতে পারব না। ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে পিঙ্কি আর রাজেশ নামছিল। পিঙ্কিকে এত সুন্দর লাগছিল যে রাজেশ তার পাশে

একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। রানী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পিঙ্কিকে। পিঙ্কি এত নতুন, এত আনকোরা যে মনে হয় সবেমাত্র তার মোড়ক খোলা হল। তার মাথার চুলগুলো রিং-এর মতো পাকানো পাকানো তামা আর ব্রোঞ্জের রঙ মেশানো। ঝক্ ঝক্ করছে ধাতব তারের মতো। ভুরু দুটি নিবিড় কালো। চোখের তারাটি সবুজাভ কালো। মুখের ত্বক এত চিকণ যে তার ভিতর দিয়ে হাল্কা হাল্কা নীল-কালো শিরা দেখা যায়। গালে লাল আভা খেলছে পিঙ্কির। কাল্‌চে ফুল্ল ঠোঁটের কিনারায় লাল রেখা। রক্তের রেখা। স্বাভাবিক দুই ঠোঁটের মাঝখানের বিভক্তিটি আশ্চর্য গোলাপী। এ-সবই কিন্তু স্বভাবের রঙ। পিঙ্কি কোন মেক-আপ করে না। প্রকৃতির রং একসঙ্গে এত কাছাকাছি একটি মুখে দেখা যায় না। মনে হয় সব আর্টিফিসিয়াল এমন কি পিঙ্কির চিবুকের তলায়ও সাধারণ নিয়মে ছায়া পড়ে না। তার ত্বক এত জ্যোতির্ময়, যে ত্বকে প্রতিফলিত আলোয়, তার গলার তলায় গোলাপী কমলা আলোর মতো একটু অন্য রং। পিঙ্কির পরণে ফিকে সবুজ রঙের ত্রিলনের স্যুট। গলায় হাল্কা বাসন্তী ফরাসী শিফনের স্কার্ফ জড়ানো। রাজেশ এমনিতে হয়তো সুন্দর। লম্বা ছিপ্‌ছিপে চাবুকের মতো হিল্‌হিলে চেহারা। মুখের রেখাগুলি টানা ছাঁদের।

রানীকে দেখে রাজেশ হেসে বলল চলুন, আমাদের সঙ্গে সাগরদ্বীপে ঘুরে আসবেন চলুন। আমাদের লঞ্চ 'স্বাগত'য় একটা বাড়তি স্পীডবোট আছে।

রানী জানতো রাজেশ আর পিঙ্কির সঙ্গে তার যাওয়া সোমেশ্বরদা বা মালতীবৌদি পছন্দ করবেন না। নূপুরদি যে তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শাড়ি খোঁজার বাহানা করে সেটাও যেমন রানীর মনে পড়ল, তেমনি মনে পড়ল রাজেশ তাকে দাসী কিংবা আয়া শ্রেণীর একটি মেয়ে ভেবেছিল বলেই এখন ভদ্র ব্যবহার করে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছে।

পিঙ্কি রানীর হাত ধরে নরম গলায় বলল, চল না বাবা, পরে কাজ করবে। তিনজনে বেশ গল্প করতে করতে যাব।

রানী বলল, উপায় নেই পিঙ্কি, আমাকে এখন নলিনীপিসির কেবিনটা গুছিয়ে রাখতে হবে।

সোমেশ্বরদা নীচের সিঁড়ি দিয়ে মালতীবৌদির সঙ্গে উঠে আসছিলেন। তিনি বোধ হয় রানীর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। ভরাট গলায় বলে উঠলেন, দেখছ মালতী, তোমার রানী আবার কাজ নিযে মাথা ঘামাচ্ছে। রানী ভাই, তোমার কেবিন পরিষ্কার করার দরকাব নেই! লোকজন কী করবে তাহলে? এতগুলো চাকর বেয়াবা?

মালতীবৌদি বললেন, সত্যিই তো! আমি বেয়ারাদেব বলে দিচ্ছি। তুমি ভেবো না রানী। রাজেশ পিঙ্কিরা চলে যাক। তুমি বরং আমাব সঙ্গে এসো। আমি তোমায় ভালো করে চুল-টুল আঁচড়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। তারপর তুমি, আমি আব তোমাব দাদা একসঙ্গে সাগরদ্বীপে যাব।

রানী বলতে যাচ্ছিল—মালতীবৌদি, আমার দিকে আপনাদের কোন মনোযোগ দিতে হবে না। আমি তো আপনাদের সমান সমান নই। আমাকে নিয়ে আপনারা সবাই খামোখা এত বাড়াবাড়ি করবেন না। সমস্ত ব্যাপাবটাই আগাগোড়া ভুল হচ্ছে। আমি নলিনীমাসির সঙ্গিনী। ভাড়া করা একটি গরীবের মেয়ে। আমাকে ওই ভাবে থাকতে দিন।

কিন্তু সে মালতীবৌদির চেয়ে আদব-কায়দা কম জানে। তাকে অদ্ভুত কায়দায় সস্নেহে সরিয়ে নিয়ে মালতীবৌদি একেবারে 'রাজেন্দ্রাণী'র অন্য প্রান্তে নিয়ে গেলেন। রানী দেখল 'রাজেন্দ্রাণী'র সঙ্গে জুড়ে রাখা ছুটো স্পীডবোট নিয়ে রাজেশ, পিঙ্কি আর বাজেশের বন্ধুরা সাগরদ্বীপের দিকে চলে গেল।

মালতীবৌদি আর রানী তাদের যাওয়া দেখতে লাগল। জল

কেটে স্পীডবোট ছুটে চলল সাগরদ্বীপের দিকে। মালতীবৌদি বললেন, রানী, তুমি সাগরে চান করবে না? মকরবাহিনীর পূজো দেবে না?

রানী ফিরে তাকালো। মালতীবৌদির পরণে জরি-পাড় টক্‌টকে লাল শাড়ি। ঈষৎ হেসে রানী বলল, আপনি স্নান করবেন না? পূজো দেবেন না?

—হ্যাঁ দিতে পারি। তবে আমার দেওয়ার আর দরকার পড়বে না। আমি বোধ হয় তিন-চারবার এসেছি। পূজোও দিয়েছি। এখানে পূজো দিতে পারা তো মহাপুণ্য।

—আর বৈতরণী পেরোনো?

সোমেশ্বরদার জলদ্‌গম্ভীর আচমকা কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকাল রানী। 'বৈতরণী' এই কথাটার সঙ্গে মৃত্যু এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রানী তো বৈতরণীই পেরিয়ে যেতে চায়। সে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই সোমেশ্বরদা বললেন, চল না একবার সাগরদ্বীপে। তারপর দেখবে কেমন বামুনঠাকুররা রোগা রোগা বাছুরের লেজ ধরিয়ে মন্তর পড়িয়ে, প্রণামী নিয়ে সবাইকে একধারসে 'বৈতরণী' পার করে নিয়ে যাচ্ছে।

রানী কেঁপে উঠল একটু। সোমেশ্বর লক্ষ্য করলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেমন লোলুপ হয়ে উঠল। লোলুপ অর্থে এমন একটা কিছু রানীর অজান্তেই ঘটে গেল যেটা তাঁর পছন্দ মতো। এবং মালতীবৌদি তাঁর গভীর কালি-পড়া চোখ দিয়ে তা লক্ষ্য করলেন।

মালতীবৌদি এবারে সোমেশ্বরের দিকে ফিরে বললেন, সাংসারিক কর্তব্য তো অনেক হল, এবার যাও, তৈরি হয়ে নাওগে। শোন, তোমার প্রেশারের ওষুধটা খেয়ে নেবে আগে। আর জল খাবে বেশি করে। আর শোন, ওখানে টেন্টে চা-টা সব তৈরি হচ্ছে তো?

সোমেশ্বর বললেন, হ্যাঁ! একসেট চাকর বেয়ারা ভোরেই তো পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার চিন্তা নেই। তবে দুটো বড় কলসী করে মিষ্টি জল এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। দ্বীপের জল তো আমরা খাব না। জলে যা ক্লোরিণ মেশানো!

নীচে জলের ওপর ঝক্ঝক্ শব্দ করতে করতে একটা লঞ্চ এলো। সোমেশ্বরদা সোৎসাহে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন।

মালতীবৌদিও ঝুঁকে পড়লেন।

সোমেশ্বরদা সানন্দে বললেন, মালতী, মালতী দেখ, নতুন দ্বীপ থেকে মাছ এসে গেছে।

রানী মালতীবৌদির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ছোট শ্রীহীন মেছো লঞ্চ থেকে ভাবে ভারে মাছ নামছে।

সোমেশ্বরদা বললেন, চল মালতী, নীচে নেমে মাছগুলো দেখি আর রান্নার ডিরেকসন্ দিয়ে আসি। সোমেশ্বরের মুখে জ্বলন্ত আনন্দ।

মালতীবৌদি বললেন তুমি যাও, কি রান্না হবে তুমি বলে দিলেই যথেষ্ট হবে। আমি বরং একটু আমার কেবিনে যাই! চল রানী!

সোমেশ্বরদা আবদেরে গলায় বললেন, মালতী, লক্ষ্মীটি তুমি চল। রানী ভাই তুমিও চল।

নীচে বড় বড় ঝুড়ি নামানো হচ্ছিল। লম্বা লম্বা ভেট্কি মাছ, ম্যাকারেল মাছ, চিংড়ি মাছ। কিচেনের কুকদের প্রিপারেশন বুঝিয়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ওপরে উঠে এলেন।

মালতীবৌদি বললেন, নতুন দ্বীপের মাছ তো খুব সরেস।

সোমেশ্বরদা বললেন, তাইতো দেখছি। চমৎকার মাছ।

—আমরা কবে নতুন দ্বীপে যাব?

—আজ রাতেই রওনা হব। পৌঁছতে পৌঁছতেই কাল ভোর।

রানী অবাক হয়ে বলল, সাগরদ্বীপ পেরিয়ে চলে যাব আমরা?

সোমেশ্বরদা হেসে বললেন, এটা আবার সাগর না কি? সাগর দেখবে কাল। নতুন দ্বীপের কাছে। আজ রাতেই পৌঁছে যাব। রাতে বিশেষ কিছু বুঝবে না। সকালবেলা বুঝবে। যখন নীলসমুদ্রের মধ্যে জেগে উঠবে!

—একেবারে নীল সমুদ্র?

—হ্যাঁ! সেখানে জলের রং এমনি শ্লেট পাথরের মতো নয়। গাঢ় নীল। ঢেউয়ের মাথায় শাদা শাদা ফেনা।

রানীর বুকের মধ্যে সঙ্গোপনে বেজে উঠল গানের মতো একটা লাইন—'চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!'

সাগরের নীল জলের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিতে পারলে ঠিক কেমন লাগবে? এ কথা ভারতেও রানীর আশ্চর্য ভালো লাগল।

ওপরে উঠে সে মালতীবৌদির সঙ্গে কেবিনের দিকে চলল।

মালতীবৌদিদের কেবিনটা সবচেয়ে বড়। মেঝেতে আধুনিক হাল্কা প্লাস্টিক টাইল্স পাতা। সবকিছুই লেমন ইয়োলো। বিছানা, বালিশ আসবাব, পর্দা। এমন কি বেডসাইড পশমি কার্পেটটিও। এত প্রাচুর্য এত বিলাসিত খামোখা কেন? রানী কিছুতেই ভেবে পায় না।

আজ মাত্র দুদিন হল সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদির সঙ্গে তার আলাপ। কাল ভোর থেকেই রানী লক্ষ্য করছে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুটো অদৃশ্য কল্পতরু হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যার যা চাই, তা যেন অবাধে, অগাধে ওই কল্পবৃক্ষ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। সোমেশ্বরের দামী ইম্পোর্টেড স্টেশন ওয়াগনের মতো দামী আরাম-প্রদ বিদেশী গাড়িতে, কেবল রানী কেন নূপুরদিরাও আগে কখনো চড়ে নি। অত ভোরেই গাড়িতে সাজানো থরে থরে গরম গরম খাবার। ফল। শরবত। যার যেমন রুচি। তার ওপর আবার

সারা রাস্তায় মাঝে মাঝেই থেমে থেমে, কে কি খাবে, কার কি অসুবিধা তা দেখাশুনো করা।

ওঁদের দুটি ছেলে। আমেরিকায় পড়াশুনো করছে। কলকাতায় বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি।

মফস্বলেও এখানে ওখানে ছড়ানো বাড়ি। বাগানবাড়ি।

নানান্ ব্যবসা-পত্র সোমেশ্বরের। তাছাড়াও আছে অঢেল সঞ্চিত পৈত্রিক সম্পত্তি।

এসব কথা পরশু রাতেই নূপুরদির কাছে শুনেছে। সুহাসদা নূপুরদিদের সঙ্গেও খুব একটা দীর্ঘ দিনের পরিচয় নয় সোমেশ্বর-দাদার। অথচ খুব আপন আপন ভাব। এটাই এঁদের স্বামী-স্ত্রীর গুণ।

রানা চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবিনটি দেখছিল। দেয়ালে স্বামী-স্ত্রীর দুটি ব্রোমাইড্ এনলার্জ করা রঙীন ছবি। মাদার অব পার্লের ফ্রেমে বাঁধানো। ওভাল শেপ।

সোমেশ্বরের মতো এত রূপবান পুরুষ রানী এর আগে আর কখনো দেখেনি। এত ব্যক্তিত্ব। এত প্রচণ্ড পৌরুষ। রানী মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেই আবো অল্পবয়সকে দেখছিল।

মালতীবৌদি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি শাড়ি বদলাতে বদলাতে বললেন, জানো রানী ভাই, ওর এখানে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

— কিসের অসুবিধে?

—এই ধর আদর যত্নের।

—কেন?

—সুখিয়া আসতে পারে নি তো—তাই!

— সুখিয়া কে?

— ওর সাঁওতাল রাখোয়াল ছিল।

— রাখোয়াল? সে আবার কী?

—মা-মানে কেপ্‌ট আর কী! অবশ্য এখন সুখিয়া ওর স্ত্রী। আমি বিয়ে দিয়েছি।

রানী শাড়ি বদলাতে বদলাতে অবাক হয়ে তাকাল।

মালতীবৌদি হাসতে হাসতে বললেন, কি করব বল, বাড়ির দাসী ছিল। সাঁওতাল পরগণায় বাড়ি। ওর চোখে লেগে শেষ পর্যন্ত মেয়েটা এমন অবস্থায় পড়ে গেল যে বিয়ে না দিলে জাতে পতিত হত। তাছাড়া সুখিয়ার বাচ্চা সে তো আমারই বাচ্চা, বল ভাই!

—কিন্তু আজকাল তো—!

—জানি তো ভাই, আজকাল তো দুটো তিনটে বিয়ে লিগালি করা যায় না। কিন্তু আমরা তো ভাই আজকালকার মানুষ নই। তা ছাড়া আমি নিজেই যদি বৌ হয়ে আপত্তি না করি!

রানী অবাক হয়ে মালতীবৌদিকে দেখছিল। মালতীবৌদি তাঁর লম্বা চুলের দু' বিনুনির গোড়ায় সোনার ওপর চুণী-পান্নার কাজ করা চিরুনীটা গাঁথলেন। তার চারপাশে পাঁচগুছি করা লম্বা লম্বা চাটাইয়ের মতো বিনুনী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে সোনার কাঁটা আটকে আটকে মস্ত বাগান খোঁপা বানালেন। গায়ে নানারকম ভারি ভারি সোনার গয়না পরতে পরতে বললেন, এটা ভাই ওদের বংশের ধারা। ও কি করবে বল। ওদের ফ্যামিলিতে চিরকালই বাবুদের একটি পরমাসুন্দরী নিখুঁত প্যাটরানী চাই। বড় বংশের। বড় ঘরের। বাকি সব নীচু ক্লাশের কালো কুৎসিৎ শুকনো বাজে। একটু ইমপারফেক্ট একটু ডিফেকটিভ। 'পারভারসান' আর কী। শুনেছি আমার শাশুড়ি পরমাসুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটি সতীন ছিল। সতীন বলব না। একটা খোঁড়া মেয়েমানুষ।

রানী আয়নার মধ্যে দিয়ে মালতীবৌদিকে দেখতে পাচ্ছিল। কি আশ্চর্য, আজ সকাল থেকে যাকেই দেখছে, আয়নার মধ্য দিয়ে দেখছে।

মালতীবৌদির মুখ ঠিক পুতুলের মতো। খুব ভালো করে পুতুলের মুখ দেখলে, পুতুলের একরকম বিভঙ্গহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকলে

বোঝা যায় পুতুলের মুখ কত নিষ্ঠুর। সেই ভাবলেশহীন মুখে, সামান্য মনুষ্যত্ব শুধু লেগে আছে চোখের কোলের গাঢ় কালিতে। আর একটু দূরে আয়নায় তার রোগা সাধারণ ছায়াটা কত অকিঞ্চিৎকর দেখাচ্ছে।

মালতীবৌদি কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ পরতে পরতে বললেন, কত বড় ব্যবসা-পত্র এদের। বিপুল ব্যাপার। তার সঙ্গে মিশেছে আবার আমার দিকের সমস্ত সম্পত্তি। আমিও যে আমার মা বাবার একমাত্র মেয়ে। লোকে বলে এদের দুজনের দারুন মিল হয়েছে। আমিও তাই বলি। আসলে তোমার দাদার আর আমার শখসাধ সব এক ধরণের। নতুন নতুন বাড়ি-ঘর করা। সাজানো গুছোনো। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ করা। বেড়ানো ঘোরা। মানুষকে আতিথ্য দেওয়া। বেশ আছি। বেশ আছি রানী, বল? পুরুষ মানুষের চরিত্র-দোষটা অত ধরতে নেই। কি করবে বল শরীরের খিদের ওপর কি কারো কন্ট্রোল থাকে?

রানী অবাক হয়ে তাকিয়ে শুনছিল।

তবে কিনা জানো, টাকা থাকলেই আবার ঝামেলাও জুটে যায়। গুড় থাকলে যেমন মাছি। অনেক আনডিজায়ারেব্‌ল এলিমেণ্ট।

রানী লক্ষ্য করল আয়নার মধ্যে দিয়ে কেমন তীক্ষ্ণ বন্ধুতাহীন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন মালতীবৌদি। সত্যিই তো, রানীও তো, আন-ডিজায়ারেব্‌ল এলিমেণ্ট। রানীর তো এই লঞ্চে এই ধনী মানুষদের সঙ্গে আসার কথা ছিল না।

—এদের হাত থেকে সদাসর্বদা ওকে বাঁচাতে হয়। জানো, এই আমার এক বিপদ!

রানী ঢোঁক গিলল। তার গলা শুকিয়ে আসছিল। ভয় হচ্ছিল ভীষণ।

মালতীবৌদি চপলভাবে রানীর দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা রানী, তোমার নটরাজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে? রাজেশের কোলিগ নটরাজন?

—না তো?

—কেন? ডাইনিং রুমে তো—ওঃ তুমি তো কেবিনে ব্রেকফাস্ট খেয়েছ। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওই যে টল স্লীম ডার্ক একটি ছেলে। দারুণ এ্যাট্রাক্‌টিভ!

রানীর মনে হল ন্যাকামি নয়, তৈরি করা ব্যাপার নয়। চপলতায় হঠাৎ যেন মালতীবৌদি সত্যিই চোদ্দ বছরেরটি হয়ে গেছেন।

—আজ সন্ধ্যেবেলা হয়তো ওদের লঞ্চে আড্ডা দিতে যাব। বেশ হবে পাশাপাশি দুটো লঞ্চ নতুন দ্বীপে যাবে।

নতুন দ্বীপ! রানী কেমন অন্যমনা হয়ে গেল। সাগরদ্বীপই এখনো দেখা হয় নি তার। কি অদ্ভুত রহস্যময় অনন্ত এই সাগর-সঙ্গমের বিন্দুটি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তারপরও আরো আছে। আরো। ভাবা যায়?

এই এত আন্দোলিত জলের পরেও আরো বেশি আন্দোলিত জল! গাঢ় নীল, অদ্ভুত নির্জন লোনা অজানা জল।

কালকেও যদি রানী বেঁচে থাকে সে দেখবে!

মালতীবৌদি বললেন, কি রানী, এত কী ভাবছ?

রানী হাসল। স্বপ্নাবিষ্টের মতো বলল, কালকে ভোরবেলা আমরা সত্যিকার সাগর দেখব!

মালতীবৌদি বললেন, ও, তুমি শুধু সাগরের কথাই ভাবছ! কিন্তু নটরাজন? বল নটরাজন কি দারুণ এ্যাট্রাক্‌টিভ!

রানী চমকে তাকাল মালতীবৌদির দিকে। হঠাৎ নটরাজনের কথা এলো কোথা থেকে?

মালতীবৌদি কি সারাক্ষণ, খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে, সাজতে সাজতে, রানীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, কেবল নটরাজনের কথাই ভাবছিলেন?

মালতীবৌদি বললেন, আমার কাছে নটরাজনের এ্যাট্রাক্‌সন এত বেশি হল কেন জানো রানী, অত চার্মের মধ্যেও ওর শুধু একটা ডিফেক্ট। ওই ডিফেক্টটার জন্যেই ও এত টানছে আমাকে। ও

একটু টিণ্টেড গ্লাসের চশমা পরে, তুমি লক্ষ্য করেছ বোধ হয়? ওর একটা চোখ পাথরের। বাঘে আঁচড়ে দিয়েছিল। চশমার জন্যে বোঝা যায় না।

রানী চমকে তাকিয়ে দেখল মালতীবৌদির দিকে। হঠাৎ যেন একটা পুতুল ফেটে বেরিয়ে এলো একটা রোমশ রাক্ষসী। কিন্তু বড় অল্প সময়ের জন্যে। দেখতে না দেখতে, বুঝতে না বুঝতে. সব নিমেষেই জুড়ে তেড়ে আবার ঠিকঠাক হয়ে গেল।

রানী মালতীবৌদির সাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। সে নিজেও শাড়ি বদলেছে। লালপাড় ইঁটরঙের একটা শাড়ি। শাড়ি ভরা অজস্র তিলের মতো চন্দন রঙা বুটি। রানী আর মালতীবৌদি লঞ্চের ডেকে এসে দাঁড়াল। নীচে ফট্‌ফট্ করে স্পীড্‌বোটটার ফিরে আসার শব্দ। ওদিকের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন সোমেশ্বরদা। রাজার মতো দেখাচ্ছে তাঁকে পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি আর শালে।

মালতীবৌদি ঘণ্টা বাজিয়ে হেড বেয়ারা চূড়ামণিকে ডাকলেন।

চূড়ামণি নীচ থেকে ওপরে উঠে এলো। রোগাটে পাকানো চেহারা। ধূর্ত আর বিনীত একসঙ্গে। এখন মালতীবৌদির চেহারা অন্য। রানীর মতো। রাজার সামনে রানীর মতো।

—কি চূড়ামণি, সব কেবিনগুলো সাফ্‌সুত্‌রো করেছ?

সোমেশ্বরদা প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ হে চূড়ামণি, নামখানা থেকে রসদ নিয়ে আলির ছোট লঞ্চটা এসেছে তো?

—হ্যাঁ সায়েব।

—বাঃ, কি কি ফুল এলো?

—সাদা আর ভায়োলেট চন্দ্রমল্লিকা আর লালগোলাপ।

মালতীবৌদি বললেন, বেশ, ডাইনিং রুমের পর্দাগুলো তাহলে বদলে দাও। বাসন্তীরঙের সিল্কের পর্দা দেবে। কুশন কভার দেবে লাল ভেলভেটের। টাটকা সন্দেশ আর কেক এসেছে তো?

—হ্যাঁ মেমসাহেব।

—খুব ভালো ফল?

—হ্যাঁ সব রকম ফল, পীচ আর 'লকেট' পর্যন্ত।

—বাঃ, ভালো করে ফ্রুট স্যালাড বানাবে।

চূড়ামণি ঘাড় কাত করে চলে যাচ্ছিল।

মালতীবৌদি আবার ডাকলেন চূড়ামণিকে, বাসি কেক আর সন্দেশ লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেবে! আমরা লাঞ্চের আগে ফিরছি না। লাঞ্চ একদম রেডি থাকে যেন। সব কেবিন ভালো করে দেখে নিয়ে লক্ করে চাবি তোমার কাছে রাখবে।

চূড়ামণি চলে গেলে রানী বলল, মালতীবৌদি, নামখানা থেকে ফুল সন্দেশ কেক ফল এ সব এসেছে মানে কী?

—নামখানা থেকে কেন? খাস কলকাতা থেকে। কে. সি দাস, ফ্লুরি, নিউমার্কেট থেকে। গাড়িতে নামখানা পর্যন্ত এসেছে। সেখান থেকে আলির লঞ্চে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সোমেশ্বরদা সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন, সেই সঙ্গে বৈঠকখানা থেকে টাটকা পান, আর মাংস—

মালতীবৌদি বললেন, আমাদের চিরকালই এমনি ব্যবস্থা থাকে। আমরা যখন বেরোই সব বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেই বেরোই।

সোমেশ্বরদা তালে তাল মিলিয়ে বললেন, আসল ঘটনাটা তো টাকা নয় রানী ভাই, মেজাজ!

মালতীবৌদি বললেন, নাও, এবার চল, স্পীড্‌বোট এসে গেছে।

তিনজনে একে একে নেমে স্পীড্‌বোটে উঠলেন। রানীর খুব ভয় করছিল। এমন গা ডুবিয়ে তীব্র বেগে জল কেটে চলে স্পীড্‌বোট, যে শরীর টলে যায়। কাউকে ধরে টাল সামলাতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু কাকে ধরবে সে? মালতীবৌদিকে ধরতে তার ভয় করে।

সোমেশ্বরকে ধরতে আশঙ্কা হয়। সাগর গঙ্গার জলের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তখন ঈষৎ রোদের ছোঁয়া। ছোট ছোট কালো বিন্দুর মতো হাজার হাজার মানুষের মাথা। ক্রমশ বড় আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চারিদিক থেকে সাগরদ্বীপের দিকে রংবেরঙের পালতোলা নৌকো যেন জলের ঢেউয়ের সওয়ার হয়ে উড়ে যাচ্ছে। জলের কল্লোল ছাপিয়ে উঠছে মানুষের জোকার মকরবাহিনীর জয়ধ্বনি। জলের আওয়াজ, মানুষের আওয়াজ আর সব ছাপিয়ে উন্মাদ সংকীর্তন আর মাইকের ঘোষণা। জল থেকে ডাঙা পর্যন্ত পিছল কাদামেশানো বালিতে পা পুঁতে দাঁড়িয়ে মানুষ স্নান করছে, গঙ্গাপূজা করছে, তর্পণ করছে। আর পাগলের মতো ডেকে উঠছে মা মা মা! গঙ্গাকে, জলকে, মা, মা,—

রানীদের স্কুলের হোস্টেলে মকরবাহিনীর একটা ক্যালেণ্ডার ছিল। রানীর বড় ভালো লাগত ছবিটা। শাদা শাড়ি পরা দাঘল এক দেবী ঢেউয়ের মাথায় মকরের পিঠে দাঁড়িয়ে আছেন।

রানী দেখছিল, জল থেকে যারা ডাঙার দিকে উঠে যাচ্ছিল, তাদের হাঁটু পর্যন্ত কাদামাখা। স্পীড্‌বোটের মুখটা তীর থেকে জলের মধ্যে ঢুকে যাওয়া চওড়া দুটো কাঠের পাটার ওপর গিয়ে দাঁড়াল। এত সব ব্যবস্থা শুধু সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর পার্টির জন্যে। মাটিতে কাদাতে মাখামাখি হয়ে দু'পাশে দুজন বেয়ারা ধরে ধরে নামাল সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদিকে। রানী দেখল এত কাঠের পাটার ব্যবস্থা সত্ত্বেও ওদের পায়েও বিলক্ষণ কাদা লাগল। সাগরদ্বীপের প্রকৃতি ওঁদের রেয়াত করল না।

রানীও নামল সঙ্গে সঙ্গে। বেয়ারাদের হাত নেড়ে সরে যেতে বলল। সোমেশ্বর কাঠের পাটার ওপর দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, —দেখো রানী ভাই, পড়ে যেও না।

কাঠের পাটা দুটো কাদার ওপর দিয়ে দ্বীপের সাদা ফস্‌ফসে বালির স্তর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

রানীর খুব লজ্জা করছিল। এমন ঘটা করে এর আগে আর কেউ বোধ হয় সাগরদ্বীপে নামে নি। তাদের অমন অতি আধুনিক স্পীড্‌বোট থেকে তার নামার কসরৎ দেখবার জন্যে চারপাশে মেলার মতো ভিড় হয়ে গিয়েছিল।

তার ওপর এমন অসাধারণ চেহারার দুজন স্ত্রী-পুরুষ। দৃষ্টিকটু রকম চওড়া লালপাড় শাড়ি পরা মালতাবৌদি আর চুনোট করা চওড়া ফিতে পাড় ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী আর দামী শাল জড়ানো সোমেশ্বরদা। ওই রকম সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, দোহারা চেহারা, ফেটে পড়া রঙ আর বাবরি চুল।

টেন্ট পর্যন্ত যাবার পথেই যে কত লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে হল সোমেশ্বরদাকে। মন্দির কমিটির লোক, পূজারী, পাণ্ডা, খবরের কাগজের লোক, সরকারী লোক।

রানী মাথা নীচু করে পিছন পিছন যাচ্ছিল। সে যদ্দূর বুঝল সাগরমেলার এই পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে সোমেশ্বরদা পুরোপুরি সম্পৃক্ত। সোমেশ্বরদা প্রায় প্রতি বছরই চলে আসেন। নানান্‌ কাজে তাঁকে এখানে আসতেই হয়।

কিন্তু কথাবার্তা শুনে রানী বুঝল এবার তিনি সাগরদ্বীপে পাতা জাল আরো ছড়িয়ে দেবার প্ল্যান নিয়ে এসেছেন। নতুন দ্বীপে তিনি জমি ইজারা নিচ্ছেন। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ইঞ্জিনীয়ার আর আর্কিটেক্টদের! তাঁর মাথায় আছে একটা নতুন প্ল্যান। সাংবাদিকরা নোটবই খুলে খুলে নোট নিচ্ছিল। সোমেশ্বর অদ্ভুত আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে বলছিলেন নতুন দ্বীপে তাঁর প্রথম যাওয়ার কথা। প্রথম যখন যান তখন নতুন দ্বীপ যা ছিল. এখনও তাই আছে। একটা মাছ-মারাদের আস্তানা। বাজে দ্বীপ। রাতে সেখানে জঙ্গলে বুনো দাঁতাল শূয়োর বেরোয়। সেই নতুন দ্বীপের অনেক সম্ভাবনা আছে। সোমেশ্বর আস্তে আস্তে খবরটা ভাঙলেন। তিনি ওই দ্বীপে একটা নতুন জিনিস করতে চান। একটা প্লেজার 'আইল্যাণ্ড' বানাতে চান।

সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে কে যেন সোমেশ্বরদাকে প্রশ্ন করল, —তা অমন একটা বাজে দ্বীপে, যেখানে আপনিই বলছেন, বুনো শুওরের উপদ্রব আছে, সেখানে অত টাকা খরচ করে আপনি কেন 'প্লেজার আইল্যাণ্ড' বানাতে চান স্যার ?

—ধরে নিন এটা আমাদের একটা পাগলামি!

—আমাদের মানে স্যার ?

—মানে, আমার আর আমার স্ত্রীর।

একজন হোমরা চোমরা সাংবাদিক বললে, টাকার পাহাড় খসে যাবে স্যার!

—যাক না, পাহাড়ের পরেও পর্বত আছে!

রানী সোমেশ্বরের অবলীলায় কথা বলার ভঙ্গীটা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল বলেই লক্ষ্য করে নি যে যুগল সেনও রিপোর্টারদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে একবার তাকে আর একবার সোমেশ্বরকে দেখছে।

হঠাৎ যখন যুগলকে দেখতে পেল রানী তখন তার গ্রীবায় আনল একটা টানটান অবজ্ঞা। আরো ঘন হয়ে এলো সোমেশ্বরদার কাছে। মালতীবৌদির পিছন পিছন টেণ্টে গেল না।

সোমেশ্বরদা তাঁর কাঁধের ওপর ফেলা আপাদমস্তক কারুকাজ করা ঘিয়ে রঙের শালটা গুছিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আসল ব্যাপারটা কি জানেন—আমরা ইণ্ডিয়ানরা জানি না, কি করে দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিকে ইউজফুল, মূল্যবান করে তুলতে হয়। কাজে লাগাতে হয়। বিদেশে দেখেছি, এই এতটুকু ছোট গর্ত দিয়ে ছিরিক্ ছিরিক্ করে গরম জল বেরোচ্ছে, তাতে গন্ধকের গন্ধ। ব্যস আর যায় কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে সেখানে 'স্পা'-টাউন বসে গেল। বোতল বোতল সীল করা জল বিক্রি হতে লাগল। টুরিস্ট সেণ্টার, হেল্‌থ সেণ্টার হয়ে গেল। লোকাল কটেজ ইনডাস্ট্রি নতুন বুস্টিং পেতে লাগল। দারুণ ব্যাপার। আর এখানে আমাদের বক্রেশ্বরের

অবস্থা দেখুন গিয়ে একবার। সরকার অত সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আর স্থানীয় লোকরা কি ভাবে সব নোঙরা করে, নষ্ট করে দিচ্ছে।... আপনারা বলছেন নতুন দ্বীপ বাজে দ্বীপ মাছ-মারাদের দ্বীপ,— নিজেরা গিয়ে দেখুন কি বীচ্ নতুন দ্বীপের। চমৎকার চওড়া বীচ। বেশ প্রশস্ত আর ফ্ল্যাট। একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে। এমনি বাজে ঘোলা জল নয়। সুইমিঙ বেদিঙ-ও চমৎকার চলতে পারে। বর্ষা ছাড়া সমুদ্র ওয়াইল্ড হয় না। সুতরাং উচু পাড়ের ওপর যদি সানশেড দিয়ে মেকশিফ্‌ট রেস্তোরা করা যায়, আর ফিশ এ্যাণ্ড চাপস্-এর গ্রীস, তাহলে দেখবেন কি ভিড়টা হয়। তীরে হবে সান-বেদিঙের জায়গা। আর সমুদ্রে স্নানের ব্যবস্থা। নামখানা থেকে লঞ্চে প্লেজার ট্রিপের ব্যবস্থা থাকবে। রাতে যারা দ্বীপে থাকতে চাইবেন তাঁদের জন্যে থাকবে ভাসমান হোটেলের মতো বড় বড় লঞ্চ। সাগর জলে রাত কাটানো। বলুন প্ল্যানটা সঠিক কিনা?

রানী অবাক হয়ে দেখছিল স্বপ্ন সম্ভাবনায় সোমেশ্বরের চোখের তারা দুটি উজ্জ্বল আর গাঢ় সবুজ আলো ফেরাচ্ছে। অদ্ভুত মানুষ! অদ্ভুত মাপের মানুষ। কি দরকার এদের এত প্রচুর খরচ করার। দু'দিনের জন্যে সাগরে এসেছ, -কি প্রয়োজন কলকাতার ফল কেক সন্দেশ প্যানের? কি দরকার সকাল বিকেল পর্দার কুশনের রঙ বদলানোর? ফুল সাজানোর জন্যে নিউ-মার্কেট থেকে ফুল আনানোর? এ কি এক ধরনের অর্থহীন পাগলামো নয়?

কয়েকজন জার্নালিস্ট সোমেশ্বরদার দিকে এগিয়ে এলেন।

—এক্সকিউজ মি, আপনারা কখন নতুন দ্বীপে যাচ্ছেন স্যর?

—আমরা আজই লাঞ্চের পর রওনা হয়ে যাচ্ছি হয়তো—কিংবা বিকেলের দিকে।

—আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাবেন স্যর!

—বেশ তো, চলুন না! তবে আমার লঞ্চ তো ছোট। গেস্টরা

আছেন। বড় জোর দুজনকে প্রোভাইড করতে পারি। দুজন সিনিয়র জার্নালিস্ট চলুন দুটো কাগজ থেকে।

রানী দেখল মালতীবৌদি টেন্ট থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রানী এগোতে গেল। সোমেশ্বরদা অত লোকের মাঝখানেই রানীর স্কার্ফের কোণাটা টেনে ধরে বললেন, তুমি যেও না রানী ভাই, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

তারপর জার্নালিস্টদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে সিনিয়র কে জুনিয়ার, আপনারাই বরং নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে আমাকে জানিয়ে যাবেন। আমরা এখন একটু মেলা দেখতে চললাম।

রানীকে আবার অবলীলায় নিজের বুকের কাছাকাছি যেন ছোট মেয়ের মতো আঁকড়ে ধরে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোলেন সোমেশ্বর।

রানী যেন হাঁটছিল না। তাঁর গতিতেই ভেসে চলছিল। দ্বীপের শরীরে অদ্ভুত গন্ধ। প্রধানত লোনা হাওয়া আর ভিজে কাঠ পোড়ানোর গন্ধ। শাদা কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া। দু'পাশে হোগলার স্টল। পায়ের তলায় ফস্‌ফস্‌ করে খসে পড়ছে ভিজে, শাদা চিনির মতো বালি। শীত সকালের নরম মিষ্টি রোদ্দুর হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। দূরে মুকুট সন্দেশের মতো সদ্য-গড়া মকরবাহিনীর মন্দিরটি রঙে পালিশে ঝকমক করছে। কত মানুষ যে কত ধান্ধায় এই দুর্গম তীর্থেও জড়ো হয়েছে!

রানী বলল, মন্দিরটা চারপাশের হোগলার স্টল থেকে কেমন আলাদা হয়ে আছে, তাই না? একেবারে নতুন মনে হয়!

সোমেশ্বরদা বললেন, হ্যাঁ, ওই সাগর-গঙ্গাটা একেবারে খাই খাই রাক্ষুসি। আমার দেখতাই-ই, তিন তিনবার মন্দির সরিয়ে সরিয়ে আনতে হয়েছে। এতবার ভেঙে ভেঙে যায়।

—কেন?

—দ্বীপটাকে খালি খেয়ে খেয়ে নেয় ও। মানে সাগর-গঙ্গা।

রানী চারিদিকে তাকাচ্ছিল। নীল আকাশের তলায় থালার মতো

ছড়ানো দ্বীপটা। তার ওপর অজস্র হলুদ বিন্দুর মতো হোগলার ঘর। কত রকম যে মানুষ। কত রকম যে পোশাক-আশাক। রানী এত রকম মানুষ, এত রকম পোশাক, এত রকম ভাষা এর আগে দেখেও নি। শোনেও নি। পাঞ্জাবি মারাঠি গুজরাটি, নেপালী এমনি সব চেনা মানুষ নয়। সম্পূর্ণ অজানা অন্য ধরনের সব পোশাকের চেহারায় মানুষ।

সোমেশ্বরদাকে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করছিল রানী, এরা কারা সোমেশ্বরদা? এ রকম চেহারার মানুষ তো এর আগে দেখি নি কখনো?

সোমেশ্বরদা বললেন, এরা সব নানা ধরনের উপজাতি। গ্রামীন উপজাতি। সভ্যজগতের কোন খবরই রাখে না। অথচ জানে, 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।' কেউ দক্ষিণ ভারতের, কেউ রাজপুতানার, কেউ আসামের, কেউ গাড়োয়ালের। নাগা সন্ন্যাসীদের বিরাট বিরাট দল ঘুরছে। জটাজুটধারী ছাই মাখা সব নির্লিপ্ত নগ্ন পুরুষ। সাজ নেই সজ্জা নেই, আবরণ নেই আভরণ নেই। আবার চলেছে সাজসজ্জা আড়ম্বর করা সঙ্কীর্তনের দল। সঙ্গে ছবি, মূর্তি ঝালর দেওয়া বড় বড় পাখা, মালা, জরি কত কী।

রানী দোকানে দোকানে ঠাসা চোখ ভুলোনো জিনিস দেখছিল। হালুইকরের দোকানে গরম গরম খাবারের জন্য তুমুল ভিড়।

সোমেশ্বরদা এগোতে এগোতে বললেন, বল, তোমার কেমন লাগছে রানী?

—দারুণ লাগছে! আচ্ছা সোমেশ্বরদা, আপনি যেন আমাকে কি বলবেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ, বলব রানী ভাই। একটু ফাঁকার দিকে যাই চল।

রানীর একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত হল। সুখিয়ার কথা হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল তার। সুখিয়া না থাকায় সোমেশ্বরের খুব অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয়। সত্যি-ই।

রানী যতটা পারছিল সারা দ্বীপ দেখে দেখে নিচ্ছিল। একটু দূরে গিয়ে সোমেশ্বরদা বললেন, দেখ রানী ভাই, আমি আর তোমার মালতীবৌদি চেনাজানা সকলের সুখ চাই। সবাই আনন্দে থাকুক, ভালো থাকুক। তার জন্যে যদি আমাদের দুজনকে কিছু করতেও হয়, তা-ও করতে রাজি আছি। করিও। এই তো সেদিন, তিনমাসও হয় নি, আমার বন্ধুর ছেলেটি বাজে গ্রুপের সঙ্গে মিশছিল। তাকে নিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী কাজকর্ম ফেলে, সারা কুমায়ুন রেঞ্জটা ঘুরে এলাম। ছেলেটির মনের একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদিও আমাদের নিজেদের একমাস সময় সম্পূর্ণ নষ্ট হল। তা হোক্‌গে! ওকে সময় নষ্ট হওয়া বলে না। কি বল রানী ভাই? আমাদের মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। বলতে পারো, আমাদের দুজনেরই মনে। তাই তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি কিছু মনে করবে না তো ভাই?

—না না! অপ্রস্তুত হেসে বলল রানী। তারপর আর একবার নিজেকে সোমেশ্বরের ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে বৃথাই ছাড়ানোর চেষ্টা করল। মানুষটা এত সহজে এগিয়ে আসে, এত সাবলীল যে তাঁকে কিছু বলাও যায় না। কিছু মনে করাও যায় না। অপ্রয়োজনেও সোমেশ্বরদা কণ্ঠস্বরটা খুব নামিয়ে বললেন, আচ্ছা রানী, সুহাস আর নূপুরের মধ্যে কি কোন রকম মনোমালিন্য হয়েছে?

—কৈ-নাতো! রানী চমকে উঠল।—কে বলল আপনাকে?

—তুমি সত্যিই কিছু জানো না?

—না-তো!

—বেশ!

—আপনি আমাকে লুকোচ্ছেন? আমাকে বলুন না কি জন্যে এ কথাটা বললেন?

সোমেশ্বরদা চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারা দ্বীপের ওয়াচ-টাওয়ারের দিকে যাচ্ছিল। খালি গায়ে, শাদা ভস্ম মেখে অস্বাভাবিক

পাকা আর বড় মুখ আর অপুষ্ট শরীর সমেত একটি কিশোর সন্ন্যাসী একবোঝা কাঁটার ওপর শুয়ে ছিল। তার দিকে চোখ রেখে সোমেশ্বরদা বললেন, আজ সকালে একটা অদ্ভুত কথা কানে এসে গিয়েছিল আমার। ডাইনিং রুমে। আমি শুনতে চাই নি। আমি লোকের প্রাইভেসিকে সম্মান করি। চা খেতে খেতে নূপুর সুহাসকে চাপা গলায় বলছিল,—এতই যদি ঘৃণার কারণ হয়ে থাকি আমি, তাহলে বরং আমি চলেই যাই!

সুহাস চাপা গলায় বলছিল, কোথায়?

—কোথায় আবার, আমি চোখ বুজতে পারি। আজ রাতেই চোখ বুজতে পারি। এমন ঘুম ঘুমিয়ে যেতে পারি, যে কাল সকালে জেগে উঠে—আর তোমার লজ্জার ঘেন্নার কারণ হব না!

রানী ঘুমের কথা শুনে চমকে তাকাল সোমেশ্বরের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ল কয়েকটা কথা। কয়েকটা ছবি ভেসে গেল তার সামনে দিয়ে।

কাল রাতে নূপুরদির সঙ্গে সুহাসদার যে টুকরো-টাকরা কথা শুনেছিল সব জুড়ে তেড়ে গেল তার মনের ভিতর। নূপুরদির চোয়াল শক্ত হয়ে আসা, আর হাতের মধ্যে নয়ন-সুকের ইংরিজি 'আর' এমব্রয়ডারী করা রুমাল। এই সব টুকরো দৃশ্য পুড়তে থাকলে রানীর ভিতর দাউ দাউ করে।

তাহলে নূপুরদিই কি তার ঘুমের বড়ির শিশিটা চুরি করেছে? নূপুরদিই কি খুঁজে পেয়েছে না কি তার অত কষ্টে জমা করা ঘুম?

রানী নিজের অজান্তেই তার হাতের উল্টো পিঠটা মুখে চাপা দিয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড়বে?

সোমেশ্বরদা বললেন, হ্যাঁ, শুধু কথা নয়, ব্যাপারটা আরো অনেক দূর গড়িয়েছে। মালতী নূপুরের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ঠোঁটে লাগাবার ক্রীম-ওয়াক্স নিতে গিয়ে এই শিশিটা খুঁজে পেয়েছে। ও আমাকে সমস্ত কথা জানাতে, আমি ওকে বললাম, কোন পথ

নেই মালতী, তুমি সোজা ওর ব্যাগ থেকে ওষুধের শিশিটা চুরি করে নাও।

সোমেশ্বরদা পকেট থেকে রানীর হারিয়ে যাওয়া সেই লম্বা সরু শিশিটা বের করলেন। থাক্ থাক্ করে ট্যাবলেটগুলো পর পর সাজানো।

রানী হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিতে গেল। তার মুখে এসে যাচ্ছিল —ওটা আমার, আমাকে দিন সোমেশ্বরদা। সে অতি কষ্টে সামলাল। তার চকিতে মনে পড়ল পরশু রাতে সে যখন সুহাসদার জন্যে চা বানাতে যায়, তখন নূপুরদি তার ঘরে অনেকক্ষণ একা ছিল। নূপুরদি হয়তো মাটিতে চক্‌চকে সোনালী কানের রিঙটা পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলতে গিয়েই হয়তো, মাটিতে পড়ে থাকা শিশিটা তুলে নিয়েছিল।

সোমেশ্বরদা শিশিটা পকেটে পুরে রেখে বললেন, পাগল, তুমি শিশিটা চাও কোন্ দুঃখে? এটা আমার কাছে থাক। আর যত দূর বুঝলাম তুমি কিছুই জানো না এ সব অশান্তির ব্যাপারে। সুতরাং আশা করব, তোমার আর আমার এই কথাবার্তা তুমি ভুলে যাবে একেবারে।

যেন কিছুই হয় নি এভাবেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সোমেশ্বরদা। রানীকে নিয়ে তিনি মেলার ভিড় ভেঙে চললেন ওয়াচ-টাওয়ারের দিকে। বললেন, চল, ওয়াচ-টাওয়ারের ওপর থেকে সারা দ্বীপটা কেমন দেখায় দেখবে চল। রানী বুঝতে পারছ না, এ কি অদ্ভুত জায়গা। এককালে এখানে বাঘ আসত। বুনো শুয়োর আসত। লোকজন বিশেষ খবর রাখত না এই তীর্থের। তুমি বাংলার একেবারে শেষ সীমানায়। গঙ্গার মোহনায়। চার-ধামের এক ধাম। কথায় বলে না—'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার'।

ওয়াচ-টাওয়ারের নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রানীর আস্তে

আস্তে সাহস বাড়ল। আকর্ষণ বাড়ল। বিতৃষ্ণাও বাড়ল। এই লোকটি, এবং লোকটির স্ত্রীটি কি ক্লান্তিহীন। এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শো-বিজ্, হতে পারত। ক্ষমতা ছিল।

কিন্তু এত কেন? সবটাতেই খামোখা এত অতিরিক্ত কেন? এত লোক দেখানো। ওয়াচ-টাওয়ারের ওপরে সিকিউরিটির লোক। মেলা কমিটির লোক। সোমেশ্বরদাকে দেখে যথারীতি হাতও কচলাল, সেলামও জানাল। অনেক নীচে সাগরদ্বীপের ছড়ানো চেহারাটা। শাদা বালি ঢাকা সাগরদ্বীপের ওপর অজস্র হোগলার চালার ছোট ছোট ফোঁটা। কেবল মন্দির ছাড়া মেলায় আর কোন তেমন স্থায়ী ঘর-দোর নেই। দ্বীপের কিনারায় কিনারায় সাগর। সাগরে নৌকোর ভিড়। তারই ভিতর থেকে সোমেশ্বরদা দেখালেন ওই ছ্যাখ, আমাদের 'রাজেন্দ্রাণী'।

ওয়াচ-টাওয়ার থেকে 'রাজেন্দ্রাণী'কে যেন খেলনার স্টীমার মনে হচ্ছিল রানীর। অসত্য।

ঠিক যেমন 'রাজেন্দ্রাণী'থেকে অসত্য মনে হচ্ছিল সাগর-দ্বীপটাকে।

রানী বলল, আচ্ছা সোমেশ্বরদা, মেলা মিটে গেলে সারা দ্বীপটা একদম খাঁ খাঁ করে?

—হ্যাঁ, একদম। কিছুই থাকে না বলতে গেলে।···আরে আরে. ওই ছ্যাখ রানী, নীচে ওই পুঁতির মালার দোকানের পাশে তোমার পিসিমারা আর পিসেমশাই চা খাচ্ছেন।

রানী বলল, সত্যিই তো, আরে ওই তো! কি ছোট্ট ছোট্ট দেখাচ্ছে ওদের!

সোমেশ্বরদা আবার হাত বাড়িয়ে দেখালেন, ওই ছ্যাখ, ছ্যাখ একদল নাগা সন্ন্যাসীর পাশে বসে তন্ময় হয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করছে পিঙ্কি আর রাজেশ! বাঃ, দেখার মতো দৃশ্যটা!

রানী আর সোমেশ্বর সমস্বরে হেসে উঠল।

—আরে আরে, সবাইকেই দেখা যাচ্ছে। দেখুন সোমেশ্বরদা।

ওই যে, সুহাসদা আর নূপুরদি। হাতের ভিতর হাত গলিয়ে দারুণ মেজাজে মেলায় ঘুরছে। দুজনে আবার দিব্যি দুটো তালপাতার টোকা কিনে ফেলেছে। আবার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা! প্রায় সবাইকেই দেখা যাচ্ছে তাই না সোমেশ্বরদা। বেশ মজা!

—হ্যাঁ, কেবল তোমার মালতীবৌদিকে না!

সোমেশ্বরের হাসিমাখা চোখের ভিতর থেকে দুটি বিরহ-বিন্দু যেন আকুল হয়ে খুঁজছিল মালতীবৌদিকে। কিন্তু মালতীবৌদি কোথাও নেই। কে জানে হয়তো মকরবাহিনীর মন্দিরে গিয়ে নিজের সব গোপন দুঃখ উজাড় করে দিয়েছেন। রানী হঠাৎ সোমেশ্বরদার দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা সোমেশ্বরদা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, আপনি কিছু মনে করবেন না বলুন!

সোমেশ্বরদা ঈষৎ হেসে বললেন, বাঃ, বেশতো, স্মার্টলি আমার ডায়ালগটা দিব্যি আমাকেই ফিরিয়ে দিলে? বল বল—

—আপনি ঠিক রাগ করবেন আমার ওপর।

—আমায় কখনো তুমি রাগ করতে দেখেছ কোন দিন রানী ভাই?

—আচ্ছা সোমেশ্বরদা, মানুষকে খুশি করাই আপনার হবি, তাই না?

—হ্যাঁ, তাই তো।

—তাহলে কি করে মালতীবৌদি থাকতে, সুখিয়াকে বিয়ে করলেন আপনি?

—সুখিয়াকে বিয়ে?

—হ্যাঁ, মালতীবৌদির দুঃখ হয় না বুঝি?

সোমেশ্বরদার ভ্রূ দুটি ঈষৎ উঠল। তিনি গভীর চোখে রানীর দিকে তাকালেন। তাঁর ঈষৎ সবুজাভ দুটি চোখ পিঙ্কির চোখ দুটিকে মনে করিয়ে দেয়। বেদনার কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখা ধরল সোমেশ্বরদার মুখে। তিনি রানীর চোখে চোখে রেখে বললেন, সুখিয়ার কথা মালতী তোমায় বলেছে? কি বলেছে?

—বলেছেন আপনার বাড়ির একজন সাঁওতাল কাজ করার লোকের সঙ্গে উনি আপনার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কারণ বিয়ে না দিয়ে উপায় ছিল না।

—মালতী বিয়ের কথাও বলেছে? ও, তার মানে মালতীকে এখন সুখিয়ায় পেয়েছে?

—হ্যাঁ, মালতীবৌদি বলছিলেন, এটা নাকি আপনাদের ফ্যামিলির একটা ধারা! আপনাদের ফ্যামিলিতে নাকি, খুব নিখুঁত সুন্দরী একজন বড় ঘরের রাজমহিষী, পাটরানী থাকে। আর বাকি সব, ওই সুখিয়ার মতো, আর ধরুন আমার মতো কালো, সাধারণ ইম্প্যারফেক্ট!

—বাঃ, চমৎকার!

সোমেশ্বরদার ঠোঁটের কোণ ঈষৎ হাসিতে বঙ্কিম হল একটু। তিনি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা, মালতী তোমায় মিসেস সাহানী, স্টেলা ডিকিনসন, মোহিনী কুঙ্কুম, বেলারানী এদের কথা কিছু বলে নি? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো আছে, আরো আছে, ফুলমতিয়া, মহাদেবী, তারামতী!

—হয়তো বলবেন, সময় পান নি হয়তো! যাক্‌গে, ও সব কথা থাক। আসুন, সমস্ত ব্যাপারটা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। নীচে নেমে মেলার ভিড়ে গিয়ে মি. শ।

রানী নামতে আরম্ভ করল সঙ্কীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িটা রীতিমত দুলছে। ভয় হয়। তার পিছন পিছন সোমেশ্বরদা। রানী একটু হেসে ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, জানেন সোমেশ্বরদা, যে ইঞ্জিনীয়র নিজের বাড়ির জলের কল লিক্ করলে সারায় না, তার কোন বড় বাঁধ বাঁধবার অধিকার নেই। বলুন, তাকে কি কোন দায়িত্বের ঝুঁকি দেওয়া যায়?

—না, যায় না।

নীচের বালিতে পা রেখে রানী মিনতি করে বলল, দিন না, দিন না শিশিটা আমায়! না হয় প্রেজেন্ট-ই করে দিন।

সোমেশ্বরদা ততক্ষণে আবার সহজ সাবলীল হয়ে গেছেন। বললেন, পাগল! এতক্ষণ ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ছোট্ট একটা মেয়ে। এখন দেখছি তা একেবারেই নয়। তুমি দিব্যি বড় হয়ে গেছ। আর তোমার মতো বড় মেয়ের খেলা করার বস্তু ওটা নয়।

রানী ঠিক তখনই একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখল মালতীবৌদি আর নটরাজনকে। মালতীবৌদির ঘোমটা খুলে গেছে। হাঁটার ধরণ পাল্‌টে গেছে। তিনি যেন হাল্কা। উড়ন্ত। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বরদার মুখের দিকে তাকাল।

তিনি হয়তো দেখতে পান নি মালতীবৌদিকে। আর মনে মনে বলল, সোমেশ্বরদা, আপনিও আমার চোখে অনেক, অনেক বড় হয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তো··! ঠিক তখনই একটা ফুলের পাল্কীতে বসা জীবন্ত এক সাধুকে মূর্তি বানিয়ে উন্মত্ত এক সংকীর্তনের দল তাকে আর সোমেশ্বরদাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চলে গেল। হঠতে হঠতে হঠাৎ মেলার একটা জায়গায় এসে চারপাশে তাকিয়ে রানী দেখল একটাও পরিচিত মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। এখন রানী কোন্‌ দিকেই বা যায়। এত বড় একটা মেলায় রানী কি করে একা একা ঘুরবে? এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ভূত দেখার মতো রানী দেখল যুগল সেন একটা দোকানের পাশ থেকে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতেই যুগল সাহস করে এগিয়ে এলো। রানী যে আগেই তাকে দেখতে পেয়েছে সে ভাবটা একেবারেই প্রকাশ করল না। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে বলল, আরে, আপনি! আপনি এই সাগরমেলায়?

রানী ইচ্ছে করেই আপনি বলল। কারণ এখন যে রানী কথা বলছে সে রানী পরশুর রানী নয়। পরশুর রানী আসলে তো মরেই গেছে। এ যেন একটা মৃতকল্প রানীর একটা প্রলম্বিত, বাড়তি জীবন। যুগল সেন মোটামুটি সেই কলকাতার যুগল সেনেরই মতো। সামান্য তফাৎ এই যে, যুগলের চুল এলোমেলো।

গালে একদিনের দাড়ি। আর পরণের পোশাকটা কিঞ্চিৎ ম্লান।

না, আরো একটু তফাৎ। সেটা শরীরে নয়, ভঙ্গীতে। যেন রানী যুগল সেনের বস্। এমন ভাবে অদ্ভুত বশম্বদ হাসছিল যুগল সেন। এই হাসিটাতেই তার কিঞ্চিৎ খটকা লাগল।

যুগল সেন বলল, কত দিন পরে দেখা হয়ে গেল, তাই না?

রানী হেসে বলল, হ্যাঁ, বোঝা গেল, পৃথিবীটা গোল।

—আমাদের কাগজ থেকে আমাকেই এখানে রিপোর্টিঙ করতে পাঠাল। এ্যাসাইনমেণ্টটা লাস্ট মোমেণ্টে পেলাম কিনা, তাই তোমাকে জানানো হয় নি।

রানী মনে মনে কুলকুল করে হাসল। এমন করে কথা বলছে যুগল, যেন রানীকে ওর হাঁচি-কাশি, যাওয়া-আসা সব নিত্য নিয়মিত জানায়। যেন ইতিমধ্যে কয়েকটা মাস তাদের দুজনের মধ্যে কিছু ঘটে নি। যুগলের সঙ্গে যে কত দিন দেখা হয় নি রানীর, কত দিন যুগল ভালো ভাবে কথা বলে নি তার সঙ্গে, কতবার রীতিমত তাচ্ছিল্য, অপমান করে তাড়িয়েছে তা যেন যুগলের এখন আর একদম মনে নেই। এখন, এই মুহূর্ত থেকে সে যেন রানীকে ছাড়া আর বিশ্ব-জগতে কিছুই জানে না। রানীর মনে পড়ে গেল,—শেষ তিনটে যন্ত্রণাদায়ক আশাহীন মাসের কথা। যে মাসগুলো, সপ্তাহ হয়ে, দিন হয়ে, ঘণ্টা হয়ে, মিনিট হয়ে, সেকেণ্ড হয়ে অক্ষৌহিনী সেনার মতো বর্শা উঁচিয়ে উঁচিয়ে, তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে একটা বিষের শিশির দিকে।

রানীর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে কোমল সাধিত গলায়, যে গলায় প্রথম আলাপের সময় কথা বলত যুগল, বলল, তোমাকে সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখলাম যেন?

—হ্যাঁ।

—কবে আলাপ হল ওঁর সঙ্গে?

ইচ্ছে করেই বলল রানী, বহু দিন।

—কৈ আমায় বল নি তো?

—বলবার মতো কথা বুঝি?

—না অত বড় একটা মানুষের সঙ্গে তোমার এত আলাপ যখন, তাহলে কেন পাগলের মতো চাকরি চাকরি করে ঘুরে বেড়াতে তুমি?

—ও, ওঁর বুঝি অনেক ক্ষমতা?

—কি বলছ তুমি। কত রকমের ব্যবসা ওঁর। কত পৈত্রিক সম্পত্তি। তাছাড়া কত রকম নতুন সব প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত। উনি কি না পারেন।

—তাই না-কি?

—রানী তুমি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে? প্রার্থীর মতো যুগল সেন তাকাল রানীর দিকে। —প্লিজ বল। মাই কেরিয়ার উইল বি মেড ··তুমি সোমেশ্বর রায়চৌধুরীকে বলে বুঝিয়ে আমাকে তোমাদের লঞ্চে একটু জায়গা করে দেবে। যদি 'প্লেজার আইল্যাণ্ড' সম্বন্ধে 'স্কুপ' করতে পারি, হয়তো আমার ফিউচারই পাল্টে যাবে।

রানী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকাল যুগলের দিকে। যেন ' মাথায় কিছু নিতে পারছে না। ঠাহর করতে পারছে না। আসলে কিন্তু সে সবই বুঝতে পারছিল।

—রানী, লক্ষ্মীটি, তুমি বললেই হয়। সোমেশ্বরবাবুর সঙ্গে তুমি যেভাবে কথাবার্তা বলছিলে···

যুগল সেনকে ছেড়ে রানী আস্তে আস্তে মেলার মধ্যে দিয়ে, যেন স্বপ্নচালিতের মতো হাঁটতে লাগল। তার পিছনে দাঁড়িয়ে যুগল কয়েকবার ডাকল তাকে। কিন্তু রানী যেন শুনতে পেল না। কিংবা অনেকটা দূর থেকে আবছা শুনল। আর যদি দু'দিন আগেও এইভাবে কাকুতি-মিনতি করত যুগল সেন, রানী বোধ হয় তার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারত। কারণ তখনো তার জীবন ছিল। কিন্তু এখন তো সে মৃত। যে মুহূর্তে বিষের শিশিটা সে ঘুমের ট্যাবলেট

দিয়ে পূর্ণ করতে পেরেছিল, জীবনটাকে ফেলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, সেই মুহূর্ত থেকেই তো সে কেবল একটা বাইরে জীবন্ত জীবন্ত দেখতে প্রাণহীন মানুষ। তাই না?

'প্রিয় যুগল', ছেঁড়া ব্যাগে, খামের মধ্যে ভরে রাখা দুটো চিঠির একখানা মনে পড়তে লাগল রানীর। চিঠির কালো কালো লেখা-গুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। আর দু'পাশে ছায়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল মেলার জগত। পিছনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুগল।

প্রিয় যুগল,

মানুষ, মানুষের পাশে এসে কখন দাঁড়ায় বল তো? বিশেষ করে ভালোবাসার মানুষ?

তুমি তো জানো, তুমি তো জানো যুগল, আমার কেউ নেই। তুমি তো জানো, তুমি ছাড়া আর কেউ আসে নি আমার জীবনে। তবু আমার দুঃখের সময়, আমার বিপদের সময় সবচেয়ে প্রথমে তুমিই আমায় পরিত্যাগ করলে? আজ এই চিঠি লিখতে বসেছি দুপুর রাতে। মোমবাতি জ্বালিয়ে বই আড়াল দিয়ে। পাছে আমার রুম্ মেটদের ডিস্টারবেন্স হয়। এই বিছানার মধ্যে একা শুয়ে আমার মনে হচ্ছে —কিছু মনে কোরো না, আমার বিদ্যে সামান্যই, আমার মনে হচ্ছে সেই বিখ্যাত বহুপঠিত কবিতার কয়েকটা লাইন। চারিদিকে জল, জল চারিদিকে। তবু পিপাসার জন্যে একটি ফোঁটাও না, একটি ফোঁটাও না। আমার ঘরে মানুষ। ঘরের বাইরে মানুষ। রাস্তায় ফুটপাথে, শহরে, অন্য শহরে এই পৃথিবীতে মানুষ আর মানুষ। কিন্তু একটা মানুষও তো আমার কেউ নয়। আমার কিছু নয়।

তাহলে যুগল মিথ্যে আর কেন?

আচ্ছা যুগল, রাত্রি কি মানুষকে দুর্বল করে দেয়? রাত্রি কি মানুষকে দিয়ে এমন সব কথা লিখিয়ে নিতে পারে, যা মানুষ দিনে লিখত না?

তাই হবে হয়তো। তাই এই আমি, এই দুর্বল আমি তোমাকে কত অর্থহীন কথা শেষবারের মতো মনে করিয়ে দিতে চাইছি। যেমন ধর, ধর সেই আমাদের প্রথম আলাপের দিনগুলোর কথা।

তুমি আমাদের হোস্টেলে এসেছিলে হোস্টেলের মেয়েদের ইন্টারভিউ করতে। তখুনি সুযোগ পেয়ে আমি তোমায় বলেছিলাম, আমি সাংবাদিকতা সম্বন্ধে কৌতূহলী। তুমি আমাকে তোমাদের কাগজের অফিসের ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলেছিলে।

আমি তখন কি আর করি? কিছুই তেমন না। বি. এ. পাশ করে ওয়ার্কিঙ উওমেনদের এই হোস্টেলে উঠেছি, আর পাগলের মতো চাকরি চাকরি করে ঘুরছি। তুমি জানো না, তোমায় বলি নি, আমি চাকরি করি না বলে হোস্টেলের চাকুরে মেয়েরা আমাকে বিশ্বাস করত না। অফিস যাবার সময় এমন কি তেল সাবানটাও চাবিবন্ধ করে রেখে যেত।

তুমি আমায় প্রথম আলাপের পর আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে। আমি কেন যে সত্যি কথাগুলো তোমায় বলে ফেলেছিলাম। কে জানে। হয়তো সেই জন্যেই তোমার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার আত্মীয়-স্বজনরা কেউ দেখে না। কখনো কখনো চিঠি লিখলে, গিয়ে দেখা-টেখা করলে ঘৃণার সঙ্গে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয় বা ছুঁড়ে দেয়। কিংবা দেয়ও না। একমাত্র রেবতীপিসি ছাড়া। রেবতীপিসির কেন জানি না আমার ওপর এক ধরনের স্নেহ আছে। রেবতীপিসি আমার বাবাকে হাজার দোষ সত্ত্বেও হয়তো ভালোবাসত। আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে এত ঘেন্না করে দূরে রাখে কেন জানো যুগল—ওরা বলে, মেয়েটার মা বাবা যত দিন বেঁচে ছিল, আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেছে। এখন মেয়েটা জ্বালাচ্ছে। এইটুকুই তোমায় লজ্জায় বলি নি যুগল। আমার বাবা ছিল রেসুড়ে, মাতাল আর ছিঁচকে চোর। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে জিনিস চুরি করত বলে সাবধানে তটস্থ

থাকত সবাই। দামী জিনিসপত্র আমার বাবার হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে রাখত। আর আমার মা ছিলেন বর্ণহীন। চরিত্রে দৃঢ়তা বলে কোন বস্তু ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনাহীন সাহসহীন একটা ভীতু নারী শরীর।

শুনেছি আমি হুবহু আমার মায়ের মতো দেখতে। যাই হোক, আমার মাকেও মনে নেই। বাবাকেও না। তাঁদের কোন চিহ্ন কোন ছবিও নেই আমার কাছে। প্রথমে আমার বাবা মারা যান। ফ্রি-বেডে। হাসপাতালে। বাবার ডেডবডি পোড়ানোর খরচ দিতে হয়েছিল বলে আত্মীয়-স্বজনরা রীতিমত চটে গিয়েছিল। বাবার পিছু পিছুই মা যান। আমার তখন তিন বছর বয়স। রেবতী-পিসির বাড়ি নূপুরদির দাসী আর আয়াদের কাছে আমি মানুষ। হোস্টেলে যাবার মতো বয়স হবার আগেই বয়স বাড়িয়ে, ভাঁড়িয়ে আমাকে হোস্টেলে দেওয়া হয়েছিল। পাছে নূপুরদির মনে আমি থাকলে কোন রিপার্কেসন্ হয়। আমার যদ্দূর মনে পড়ে, আমার হোস্টেলের খরচ তোলার জন্যে রেবতীপিসি বাড়িতে আত্মীয়দের বিরাট কনফারেন্স বসিয়ে ফেলেছিলেন। সোজা কথায় আমি পাঁচ-জনের দয়ায় মানুষ হয়ে ওঠা অনাথা একটা মেয়ে।

বি. এ. পর্যন্ত হোস্টেলে থেকে পড়ে আমি শেষ পর্যন্ত দু'বেলা দুটো টিউশনি আর মাঝে মাঝে দুপুরে একটা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের জন্যে ঘোরাফেরার কাজ পেলাম। এ ছাড়া আমার কি-ই বা সম্বল ছিল যুগল। যাক্‌গে ওসব দুঃখের প্যাচাল পাড়া!

তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হল তখন ভাবলাম বেশ হল। আমার একজন আপনজন হল. নিজের সম্বল হল।

প্রথমে যেদিন তোমার অফিসে গেলাম শ্লিপ পাঠিয়ে দেখা করতে হল। ভাবলাম তুমি বুঝি খুব বড় চাকরি কর। তুমি ছিলে না অফিসে। তোমার আশেপাশের টেবিলের লোকেরা বললেন—বসুন না, রিপোর্টিঙে গেছে। এখুনি এসে যাবে। তুমি এসে আমার

সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ব্যবহার করলে যে মনে হল তুমি যেন আমার কত দিনের বন্ধু। কত আপনার লোক।

যুগল, তারপর কিছু দিন আমার কি সুখের কাল গেছে। এক সঙ্গে কত বেড়িয়েছি। কত ঘোরা ফেরা। কত স্বপ্ন দেখা।

মনে আছে, তুমি বলতে আমি চাকরি করি, তুমিও চাকরি পেয়েই যাবে। তারপর আমরা বিয়ে করব।

আমার আবার বিয়ে! যুগল, আমি ভাবতেও পারতাম না। আমার মনের ভিতর তুমি, তুমিই আস্তে আস্তে বিয়ে-থা, ঘরকন্নার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলছিলে।

প্রথম প্রথম আমার যখন ইণ্টারভিউ আসত, তুমি দু-চারবার আমার সঙ্গে গিয়েওছিলে। প্রথম প্রথম তোমারও হয়তো ধারণা ছিল, আমি সহজেই একটা চাকরি পেয়ে যাব। কত দিন রিগ্রেট লেটার পেয়ে আমি যখন হতাশ হয়ে ভেঙে পড়তাম, তখন তুমি আমাকে কত সান্ত্বনা দিতে। কত উৎসাহ দিতে। কিন্তু ক্রমশ আমার অসাফল্য আমার বিফলতা তোমায় নিস্পৃহ করে তুলতে লাগল যুগল। তুমি ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে। নিরুৎসাহ হয়ে গেলে। নিরুৎসুক হয়ে গেলে।

ক্রমশ দেখলাম আবার আমি একা হয়ে পড়ছি। আমার ইণ্টারভিউয়ের সময় একা, আমার বিকেলগুলোয় একা।

তুমি আমার সঙ্গে যেমন মিশতে, তেমনি অন্য মেয়েদের সঙ্গেও মিশতে। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা সহজ করে তুলেছিলে। বলেছিলে তোমার যে পেশা, তাতে তোমাকে নানা বয়সী মেয়ের সঙ্গে মিশতেই হয়। কত রকম রোমহর্ষক গল্প করে নিজেকে আমার চোখে দামী করে তুলতে তুমি। একবার সাংবাদিকতার সূত্রে তোমাকে নাকি সোনাগাছি পর্যন্তও যেতে হয়েছিল—সে কথাও দারুণ ফলাও করে বলেছিলে তুমি। কাগজে অনেক নামহীন লেখা দেখিয়ে দেখিয়ে তুমি বলতে সেগুলো তোমার লেখা। আমি সব বিশ্বাস করতাম।

মনে পড়ে যুগল, তোমার কাগজের অফিসের খুব কাছাকাছি ছিল ভিক্টোরিয়া। সেখানে আমরা বসতাম কুর্চিগাছের তলায়। সঙ্গে একটি পুরুষ থাকায় ভিক্টোরিয়াকে, এত কাছ থেকে এমন ঘনিষ্ঠ করে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। যুগল, সেজন্যে আমি আজও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ওটা আমার ব্যক্তিগত লাভ। এই পৃথিবীকে আমি খুব কম দেখেছি। ভিক্টোরিয়া, বহু ব্যবহৃত ভিক্টোরিয়া, প্রেমিক যুগলের বসে বসে পচে যাওয়া ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালই আমার কাছে স্বর্গ ছিল যুগল।

কিন্তু মনে পড়ছে, প্রায় ছ'মাস হল তোমার সঙ্গে আমার আর তেমন যোগাযোগ নেই। তোমার দিক থেকে ভালোবাসার কোন সম্বন্ধও ছিল না। আমি তখনও বুঝতে পারি নি অনাহার অনিদ্রা উৎকণ্ঠায় ক্রমশ আমার ভিতর একটা প্রবল অসুখ ঘনিয়ে আসছে। কেবল টের পাচ্ছিলাম আমি অক্ষিদেয় ভুগছি। সব সময় মুখের ভিতরে একটা তেতো স্বাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর শরীরে কোন উদ্বৃত্ত শক্তি বাকি নেই। মনে আছে সে সময় তুমি একদিন টেলিফোনে তাচ্ছিল্যের সুরে আমায় বলেছিলে,—ইণ্টারভিউ আর দিও না তুমি রানী। ইউজলেস্। পাত্র-পাত্রী কলামে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চিঠি ছাড়তে থাক, দেখ যদি দৈবাৎ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। তারপর কত দিন আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয় নি। আমার শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। হাত পা চোখ মুখ হলুদ হয়ে যেতে আরম্ভ করল। এমন কি আমি যে জামা-কাপড় পরতাম সেগুলোও হলুদ হয়ে যেতে লাগল। অবস্থা খারাপ হতে হোস্টেলের মেয়েরা রেবতীপিসিকে খবর দিল। রেবতীপিসি দয়া করে আমায় বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলেন। চিকিৎসাও করিয়েছিলেন।

কিন্তু চিকিৎসায় কি কিছু হয় যুগল? শুশ্রূষা কই? বন্ধুহীন সঙ্গীহীন সেই গেস্টরুমের রোগশয্যায় একটি কুড়ি বছরের নির্বান্ধব মেয়ে দিনের পর দিন একা ওলোট-পালোট খেয়েছে।

একা।

সে সময় তোমায় কত প্রয়োজন ছিল যুগল। কত। কিন্তু তুমি আস নি। তুমি উত্তর দাও নি আমাকে। তোমার কথা কেবল সুহাসদা জানতেন। আমায় কেউ ভালোবাসে শুনে নূপুরদি যদি টিটকিরি দিয়ে হেসে ওঠে, তাই ভয়ে নূপুরদিকে বলি নি। আমি সুহাসদার হাত দিয়ে চিঠি পোস্ট করতাম তোমাকে। সুহাসদা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, কি রানী, একজনের সঙ্গেই চলছে তো? ঠিক তো? আজকালকার যা ব্যাপার স্যাপার। দেখো, আবার একাধিক করে বোসো না।

আমি বলতাম, না সুহাসদা, তা কেন?

সুহাসদা যখন কলকাতায় আসতেন তখন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন আমাকে—কি রানী, পত্রদূতকে একটু ওদিকের চিঠি-পত্তর দেখাও। কেবল শুষ্ক কর্তব্য করতে আর কত ভালো লাগে বল?

আমার তখন বুক দুরদুর করত। রহস্যময় হাসি হেসে হেসে আমি ম্যানেজ করতে চাইতাম। কিন্তু সত্যিই তো। যুগল বলে যে আমার কেউ আছে, কেউ ছিল, তার প্রমাণ কোথায়? কোন চিঠি না। কোন উপহার না। কোন উপস্থিতি না। তবু যুগল তোমাকে ফিরে পাবার আশা আমি ছাড়ি নি। ছাড়ব কি করে? আমি এই সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে। এদেশে নাকি মেয়েরা মনোবল দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে আপনার জনকে ঠিক কাছে টেনে আনে।

অসুখ থেকে উঠে যেদিন প্রথম পথ্য করলাম সেদিনই রেবতী-পিসি বেলুড় না কোথায় গিয়েছিলেন সারাদিনের মতো। সেই সুযোগে আমি তোমার খোঁজে বেরোলাম। আমার হাত-পা টলছে। আমার শরীরের ভিতরে বাঁশপাতার সূক্ষ্ম কাঁপনের থির্ থির্ একটা আওয়াজ। আমি সোজা তোমার অফিসে চলে গেলাম। আমাকে

দেখে তুমি তাড়াতাড়ি আমায় অফিসের বাইরে নিয়ে এসেছিলে। সামনের একটা যেমন-তেমন চায়ের দোকানের একটা খুপরিতে ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বলেছিলে, একী চেহারা হয়েছে তোমার রানী? চুল উঠে গেছে, রঙ পুড়ে গেছে!

আমি মরমে মরে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, কেন তুমি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। কেন তুমি একটা যেমন-তেমন চায়ের দোকানে ঢুকিয়ে পর্দা টেনে দিয়ে লজ্জা ঢাকা দিয়েছিলে। আমি যে ইতিমধ্যে কুৎসিৎ হয়ে গেছি, অচল হয়ে গেছি, বাতিল হয়ে গেছি, তা আমি আগে বুঝতে পারি নি যুগল।

তোমার বিস্বাদ কথা বলার ভঙ্গি দেখেও, তোমার তাচ্ছিল্য সয়েও আমি পুরোনো প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, তোমার সেই জেনারেল নলেজের বইগুলো আমাকে আর একবার দেবে যুগল?

—কেন?

—আমি একটা ইণ্টারভিউ পেয়েছি।

মাথা হেলিয়ে হোঃ হোঃ করে তুমি হেসে উঠেছিলে। বলেছিলে, হাজার বার করে তো পড়েছ বইগুলো। এখনো মুখস্থ হয় নি তোমার? আশ্চর্য ব্রেন তো!

আমি বলেছিলাম, শক্ত অসুখের পর মাথা-টাথা কেমন ব্লাণ্ট্ হয়ে গেছে যুগল।

তুমি বলেছিলে, বইগুলো আমি উষা বলে একটি মেয়েকে দিয়েছি রানী। বোধ হয় দেখে থাকবে আমাদের কাগজে মাঝে মাঝে লিখছে আজকাল।

জানো যুগল, সেদিন তুমি চলে যাবার পর আমি রাস্তা পেরোতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কেউ যদি আমার হাত ধরে আমাকে পার না করে দেয়, তাহলে বোধ হয় আমি এমনি করেই ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে থাকব। অনন্তকাল। ঠিক তখনই হঠাৎ আমার

সামনে ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে ঝুঁকে তাকিয়েছিলেন সুহাসদা। —এই রানী! রানী!

আমি যেন তাঁকে দেখছিলাম অথচ আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

সুহাসদা বললেন, এই, তোমাকে যে এখনও খুব অসুস্থ লাগছে!

আমি মর্মান্তিক চেষ্টা করছিলাম কথার উত্তর দিতে। কিন্তু আমার ঠোঁট কাঁপছিল, কথা সরছিল না।

—কি, প্রেমিকের জন্যে প্রতীক্ষা? উঠে এসো গাড়িতে, তোমায় আমি লিফ্‌ট দিয়ে দিচ্ছি।

আমি অতি কষ্টে বলতে পেরেছিলাম শুধু সুহাসদা আপনি নেমে আসুন। আপনি নিজে আমায় তুলে নিন। আমি পা তুলতে পারছি না।

সুহাসদার প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি। তিনি আমার কথাতেই বুঝতে পেরেছিলেন কতটা অসুস্থ আমি। তিনি তখুনি গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসে আমায় হাত ধরে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে নিয়েছিলেন। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে হেসে তিনি বলেছিলেন, তাহলে বল, আমি গড-সেণ্ড,—ভাগ্যিস আমি কলকাতায় কনফারেন্স এ্যাটেণ্ড করতে এসেছিলাম!

আমি বললাম, সুহাসদা, আপনি কি এখন সুখপুখুরিয়ায় ফিরে যাচ্ছেন?

—না, আমি যাচ্ছি আমাদের অফিসের একটা গেট্‌-টু-গেদারে। আজকে রাতে আমি কলকাতাতেই থাকছি। না হয় ও বাড়িতেই থেকে যাব। অবশ্য নূপুর কলকাতায় আসে নি। ওখানেই রয়েছে।

হঠাৎ আমি বলে উঠেছিলাম, আচ্ছা সুহাসদা, আপনার কি অফিসের পার্টিতে যাওয়াটা খুবই জরুরী?

সুহাসদা বলেছিলেন, না না, জরুরী হবে কেন?

—তাহলে সুহাসদা, আজকে আপনি কেবল আমাকে নিয়ে ঘুরুন। যেখানে খুশি। যতক্ষণ খুশি।

সুহাসদা স্টিয়ারিঙে হাত রেখে আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। এমন কথা আমার মুখ দিয়ে শুনবেন, বোধ হয় তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুহাসদা এমনিতেই সুপুরুষ। সেদিন তাঁকে সিনেমার হিরোদের মতো সুন্দর আর সুদূর দেখাচ্ছিল।

আমি তখনই ঠিক করে ফেললাম, আর বাঁচার কোন মানে হয় না। আমাকে মরতেই হবে। কারণ আমি মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারছিলাম সুহাসদাকে সরিয়ে দিয়ে, যুগল, বারবার তুমি আমার সামনে উঠে আসছ। যুগল, তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন রকম পয়েন্ট নেই।

সুহাসদা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, বেশ, চল, পার্টিটা এমন কিছু জরুরী না। কনফারেন্সটাই জরুরী ছিল। বল, এখন তুমি কোথায় যাবে বল, কি খাবে বল? তোমার খাওয়া-টাওয়ার আর কোন রেস্ট্রিক্‌সন্ নেই তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যে করে বললাম, না সুহাসদা, কোন রকম রেস্ট্রিক্‌সন্ নেই।

সুহাসদার কা... একদম চেপে গেলাম, আজই প্রথম তেল-মশলা ছাড়া মাগুর মাছের স্টু দিয়ে একমুঠো গলাভাত খেয়েছি। আজই প্রথম কত দিন বাদে রেবতীপিসির বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে পড়েছি।

ময়দানের পাশ দিয়ে গঙ্গার পাড় ধরে একটা চক্কর মারার পর সুহাসদা বললেন, কি, কথা বলছ না যে? বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বুঝি মন কষাকষি হয়েছে?

আমি হেসে বললাম, মন কষাকষি নয়, দর কষাকষি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জাহাজের পিছনে খাটানো থিয়েটারের সিনের মতো, অস্বাভাবিক রঙ করা বিকেলের আকাশ দেখতে দেখতে বহু দিন

বাদে আমার বাবা-মার কথা মনে পড়ল। আমি মনে মনে তাদের দুজনকে অনেক ভর্ৎসনা করলাম। বললাম—কেন আমার এত সকাল সকাল একলা ফেলে গেলে? আমি যাচ্ছি। আমি খুব শিগগিরই তোমাদের কাছে যাচ্ছি।

অনেক দিন বাদে মনে পড়ল আমার মায়ের কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। আমার বাবা ছিলেন এ্যাল্‌কোহলিক। আমি হঠাৎ সুহাসদাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা সুহাসদা, আপনি ড্রিঙ্ক করেন?

সুহাসদা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, করি। কেন?

—আমার, জীবনে একবার, শুধু একবার টেস্ট করে দেখতে ইচ্ছে করে সুহাসদা।

সুহাসদা খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে গাড়ি চালিয়ে গেলেন। যেন ভাববার সময় নিচ্ছেন। তারপর কঠিন স্বরে বললেন, বেশ তো, তোমার যখন এতখানি সাধ হয়েছে, চল, কোন বার-কাম-রেস্তোঁরাতে যাওয়া যাক।

যুগল, যুগল, তুমি যদি আমাকে কোন দিন একবিন্দু সত্যিকার ভালোবাসতে…

সুহাসদা আমাকে খুব একটা দামী রেস্তোঁরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা একটা ঢাকাঢুকি দেওয়া খোপেই বসেছিলাম। সামান্যই খাবার নিয়েছিলাম আমরা। সুহাসদা দেখছিলেন আমি খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। তিনি বললেন, এবার ড্রিঙ্কস্। কি নেবে বল?

আমি অদ্ভুত সুরে বলেছিলাম, শুনেছি আমার বাবা খুব হুইস্কি খেতেন!

সুহাসদা বলেছিলেন, হুইস্কি? হুইস্কি ঠিক নরম মেয়েলী ড্রিঙ্কস্ নয়। তুমি বরং গিমলেট্ নাও, কিংবা জিন এ্যাণ্ড লাইম। ভারমুথ-ও ··

আমি জেদীর মতো বললাম, না, আমি হুইস্কিই খাব। আমার বাবা যা খেতেন।

সুহাসদা হুইস্কিরই অর্ডার দিয়েছিলেন।

সেই বুক-জ্বালা করা বিশ্রি গন্ধ আর আস্বাদের, আগুনের মতো পদার্থটা ঢক করে গিলে ফেলতেই আমার মাথার একটা ধাক্কা এলো। ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল সমস্ত শরীর।

সুহাসদা আমাকে দেখছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বললেন, কি ব্যাপার! একেবারে ফিমেল দেবদাস দেখছি! বয়ফ্রেণ্ড কি অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করছে?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার মাথা দারুণ ঘুরছিল। তা সত্ত্বেও আমি সুহাসদাকে বললাম, আর একটু খেয়ে দেখতে চাই!

সুহাসদা আবার আনালেন। আমি আবার গিলে নিলাম হুইস্কিটা। আবার গলা বুক জ্বলতে জ্বলতে বিস্বাদ তরল আগুনটা নামতে লাগল। আর মাথায় হাতে পায়ে দুলে উঠতে থাকল একটা তীব্র ঝাঁকি।

সুহাসদা বললেন, কি, কত দূর এগিয়েছিলে?

আমি চোখ তুলে তাকিয়ে এলিয়ে পড়তে গেলাম। তারপর জোর করে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ঘাড় সোজা রাখতে চাইলাম আমি।

ও—তোমায় কখনো চুমু খেয়েছিল?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না সুহাসদা।

সুহাসদা তাঁর গ্লাসটা নিয়ে আমার পাশে উঠে এসে বসলেন। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন খানিকক্ষণ।

তারপর, আবার ফিরে গিয়ে নির্লিপ্ত মুখে নিজের জায়গায় বসলেন।

ভাগ্যিস সুহাসদা আমাকে চুমু খেয়েছিলেন। তবু জানা হল যুগল, পুরুষের চুমুর স্বাদ অন্তত কেমন? অভ্যস্ত চুমুকে নিজের পানীয়টা নিঃশেষ করে তিনি বললেন, আচ্ছা বল তো রানী, এখানে আমি আর তুমি এভাবে সময় কাটাচ্ছি,—অন্যায় করছি, আর ওখানে সুখপুখুরিয়ায় তোমার নূপুরদি, কে জানে, সে-ই বা কি করছে?

যুগল, তোমায় এত সব কথা লিখছি কেন বল তো, কারণ তুমি প্রায়ই বল না, তুমি আধুনিক কালের মেয়েদের ইন্টারভিউ করতে চাও, খোলামেলা ভাবে তাদের মনের কথা, ভিতরের কথা লিখতে চাও, তাই না ?

শোন, এরপরেও আরো আছে। আমার আগে বাড়িতে ফিরে গিয়ে চুপি চুপি গেস্টরুমে ঢুকে শুয়ে পড়া। তারপরে সুহাঁসদার আবির্ভাব। পর দিন সকালে যাবার সময়ে আমাকে আলাদা ডেকে সুহাসদা বলেছিলেন, রানী, তোমায় আমি সত্যিই খুব স্নেহ করি। শোন, তুমি চেষ্টা কোরো, তুমি খুব সাবধানে থেকো।

সাবধানেই ছিলাম। শরীরে একটু জোর পেতেই হোস্টেলে ফিরে এসেছিলাম। রেবতী পিসি শ' দুয়েক টাকা দিয়েছিলেন। তাই দুটো টিউশনিতেই মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। নিজের শরীরের ওপর বেশি চাপ দিই নি। বিশেষ কোথাও বেরোতাম না। হোস্টেলেরই ছাদে একা বেড়াতাম বিকেলে।

ক্রমশ আমার ভিতরের সেই নিদারুণ যন্ত্রণায় সময়ের প্রলেপ পড়ছিল হয়তো। বিশ্রামে থেকে শরীরও সেরে উঠছিল। কারণ কেউ কেউ মাঝে মধ্যে বলেও ফেলত, আরে রানী, তোমাকে তো বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে আজকে !

সেই সময় একদিন টিউশনি থেকে ফিরছি হঠাৎ তোমার পাশে বসতেন যে ভদ্রলোক, সমর,—হ্যাঁ, সমরবাবুর সঙ্গে আমার দেখা।

আমাকে দেখেই সমরবাবু হেসে অনেক কথা বললেন। তিনি এখন আর তোমাদের কাগজে নেই, অন্য কাগজে চলে গেছেন। সেই সব কথা। তারপর আমি, ভীতু আমি দুর্বল আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সমরবাবু বলেছিলেন, যুগলের কথা থাক না। কি দরকার ওর কথায় ?

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেছিলাম, কেন ? খুব খারাপ কিছু কি ?

—খারাপ কেন হবে। খুব ভালোই আছে। আপনার পর আরো তিনজন পাস্ হয়ে গেল। এখন স্মরিতা বলে একটা পাঞ্জাবী মেয়েকে ধরেছে। তবে অন্য মেয়েগুলো তা আপনার মতো না। যাতায়াত ছাড়ে নি। তাই যুগল ওদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। আপনার সম্বন্ধেও শেষের দিকে বলত,—নে, তোরা কেউ ওকে নিয়ে নে না, আই এ্যাম টায়ার্ড অফ হার !

যুগল, শুধু তুমি কেন, আমিও টায়ার্ড অফ মি। আমি নিজেই নিজের সম্বন্ধে ক্লান্ত। আজ দু'দিন ধরে আমি ঘুমের বড়ি জোগাড় করেছি। তোমাকে আজ একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিলাম। তুমি আস নি। কাল তোমাকে কিন্তু খবরের কাগজে আমার নাম বের করতেই হবে। না বের করে কোন উপায় নেই। তুমি তো তাই-ই চেয়েছিলে। একবার অন্তত কাগজে আমার নাম বেরোক। একবার অন্তত জীবনে সফল হই।

আমার ব্যর্থতা, আমার অসাফল্যকে তুমি ঘৃণা করেছিলে। আর আমাকে ঘৃণা করার সুযোগ আমি তোমায় দেব না।

হ্যাঁ শোন যুগল, এই চিঠিটার সঙ্গে আর একটা চিঠিও থাকছে। সেটায় সেই বাঁধা গৎটা লেখা আছে।—আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় · ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতি—

রানী

ছেঁড়া ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখা খামে ভরা দুটো চিঠিই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। রানী ভাবল। ছিঃ, যুগলের মধ্যেও তাহলে একটা ভিখিরি আছে। যুগলও বাঁকা পথে সুযোগ চায়। কাল যাকে অপমান করেছে, আজ দায়ে পড়লে, তার পায়ে পড়তে পারে।

আশ্চর্য। রানী একদিন বেশি বেঁচে ছিল বলেই তো, এত দ্রুত, এত সব গূঢ় তথ্য জানতে পারল।

ওই ভিখিরি, যুগলের জন্যে এত বড় চিঠি! এত প্রাণ খুলে লেখা। রক্তে কালি ডুবিয়ে লেখা।

নাঃ, যুগলকে আর কোন চিঠি নয়। কোন কান্না নয়। নিজের কোন গোপন কথা কাউকে বলা নয়।

রানী একা একাই নিজের মধ্যে নিজে—নিরুপায় হয়ে নয়, বাধ্য হয়ে নয়, বাঁচার উপায় থাকা সত্ত্বেও মরবে।

নতুন দ্বীপে। নীল সমুদ্রে। একা একা।

নিজেকে সে নিরাড়ম্বর একটা ঝাঁপের মধ্যে নীল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে।

রানী নিজের ঝোঁকে একা একা মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা প্রান্তে এসে পড়েছিল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওর শাড়ির প্রান্তটা টেনে ধরে বলল, এই, তুমি কি করছ এখানে?

রানীর হাত ধরল পিঙ্কি। ওর ধবধবে শাদা হাতটা রানীর শ্যামলা কব্জি জড়িয়ে।

রানী হেসে পিঙ্কির দিকে তাকাল। পিঙ্কিকে দেখলেও তার যেন মন ভালো হয়ে যায়। সে বলল, উনি কোথায় গেলেন? রাজেশবাবু? তোমার সঙ্গেই তো ছিলেন, না?

—কে, রাজেশ? ও ঘুরছে মেলায়, এদিক ওদিক।

—তুমি একা একা মেলায় ঘুরছ পিঙ্কি, তোমাকে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়?

—কেন? তুলে নিয়ে যাবে কেন?

—পুতুল ভেবে।

—ভালোই তো, পুতুল সেজে যদি সবাইকে ঠকানো যায়!

রানী আর পিঙ্কি হাতে হাতে ধরাধরি করে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল।

মেলায় প্রতি পদেই বিস্ময়। মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড। যজ্ঞ হচ্ছে। হোম হচ্ছে। আবার ভাতের হাঁড়িও চেপেছে। হাল্কা নীল ধোঁয়া

পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠছে। পোড়া পাতা আর কাঁচা কাঠের গন্ধ। মাটি থেকে উঠে আছে বালিতে পোঁতা সন্ন্যাসীর জটাজুটধারী মুণ্ড। বড় বড় চিমটে আর কমণ্ডলু নিয়ে হেঁটে আসছে একেবারে পাহাড়ী সন্ন্যাসী।

এ একটা আদিম মেলা।

অথচ এখানেও ঝুলছে শস্তা প্লাস্টিক। বাহারে ছাপা শাড়ি।

পিঙ্কি বলল, কপিল মুনির মূর্তিটা কি পুরোণো, না? সিঁদূরে, তেলে একেবারে ডোবানো। বোঝা যায় না।

রানী বলল, তুমি দেখে এসেছ?

—বাঃ, দেখে আসব না! গায়ে কাঁটা দেয়, জানো। আরো কত কী জেনে ফেলেছি এরই মধ্যে। এখানকার পুরুতরা কেউ বাঙালী নয়।

—তাই নাকি?

পিঙ্কি হঠাৎ এগিয়ে গেল একটি ছোট্ট নৌকোর সংসারের দিকে। নৌকোয় করে একটা পুরো পরিবার সাগরমেলায় এসেছে। নৌকোর পাটাতনে রান্না বসেছে। মাথায় লম্বা ঘোমটা দেওয়া রানীদের সমবয়সী একটি বউ দাঁড়িয়ে ছিল নৌকোয়।

পিঙ্কি তাকে ডেকে বলল, শোন শোন! কোথা থেকে আসছ তোমরা?

বৌটি চাপা গলায় উত্তর দিল, মেদিনীপুর—সোনাজোড়া থিক্যা!

—বাঃ, আমরা কলকাতা থিক্যা।

বৌটি অবাক হয়ে দেখছিল পিঙ্কিকে। পিঙ্কি তার হাত ধরে হঠাৎ ঝট্ করে বলল, এই, তোমাকে তোমার বর ভালোবাসে?

—যাঃ! বলে লজ্জায় পিঙ্কির হাত ছাড়িয়ে বৌটি নৌকোর ছই-এর মধ্যে পালিয়ে গেল।

পিঙ্কি রানীকে নিয়ে চলল মালার দোকানে। মালার দোকানে সারি সারি মালা। পুঁতি, কাচ, প্লাস্টিক, কাঠ, তুলসি, কুঁচ পদ্ম-

বীজের, রুদ্রাক্ষের। পিঙ্কি বোধ হয় দশ-বারো রকম মালা কিনে ফেলল দুটো দুটো করে। নিজেও সব ক'টা পরল। রানীকেও পরালো। তারপর দুজনে মিলে হাঁটতে লাগল। পিঙ্কি হোঃ হোঃ হাসছিল, প্রতিটি কথায়,—কত রকম যে মজা করছিল যাতে রানীও হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। হাসলে পিঙ্কির চোখে জল এসে যায়। হাল্কা নরম রুমালে জল মুছতে হয়। রানীর খুব ইচ্ছে হল পিঙ্কিকে নূপুরদির দেওয়া রুমালগুলো দিয়ে দেয়। রুমালগুলো পিঙ্কির হাতে খুব মানাতো। কিন্তু কি আশ্চর্য, নূপুরদির দেওয়া দ্বিতীয় রুমালটাও ইতিমধ্যে রানী কোথায় যেন হারিয়ে বসে আছে।

পিঙ্কি বলল, এই রানী, জিজ্ঞেস করলে না, রাজেশের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে কিনা?

—এর মধ্যে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে। তোমার সঙ্গে কারো ভাব না হয়ে পারে। এই ছাখ না, আমিই তোমার কি দারুণ এ্যাডমায়ারার হয়ে পড়েছি। সত্যি, বল না এবার, রাজেশবাবুর সঙ্গে ভাব হয়েছে কিনা?

—হ্যাঁ, ভাব হয়েছে।

—বাঃ, তাহলে তো আমরা বিয়েতে ভালো ভালো নেমন্তন্ন খাব!

পিঙ্কি বলল, উঁহু, মোটেই না।

—কি মোটেই না?

—ভাব তো খুবই হয়েছে। রাজেশের মতো ভালো ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। সেজন্তেই তো বিয়ে হবে না!

—বাঃ, তা কেন?

—'শেষ পাতায় দেখুন'!

রানী হেসে বলল, তার মানে রহস্যটা এখন ভাঙবে না?

—পাগল! তা কখনো ভাঙে! রহস্য আর সাসপেন্স ছাড়া আমাদের এ জীবনটায় আর কি আছে বল? চল, খিদেয় পেট চন্‌চন্ করছে। টেণ্টে যাওয়া যাক।

রানী আর পিঙ্কি যখন টেণ্টের কাছে ফিরে এলো তখন সোমেশ্বরদা বাইরে দাঁড়িয়ে জার্নালিস্টদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওঁরা তুজন প্রবীণ সাংবাদিককে প্রতিনিধি করেছেন। রানী দেখল যুগলও তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যুগলের তু'চোখে তখনও করুণ অনুনয়। পিঙ্কিকে পাশে রেখে রানী সোমেশ্বর রায়চৌধুরীর কাছে গিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে যুগলকে প্রায় শুনিয়েই বলল, সোমেশ্বরদা, আমার মনে হয় নতুন দ্বীপে কোন উট্‌কো জার্নালিস্ট না নিয়ে গিয়ে, চেনা-জানা, যাঁদের নাম-টাম আছে, কাণ্ডজ্ঞান-ট্যান আছে এ রকম তুজনকে বেছে নেওয়াই ভালো। নাহলে উল্টোপাল্টা লিখে বসবে।

সোমেশ্বরদা হেসে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ ওঁরা স্বভাবেই তুজনকে বেছে দিয়েছেন। তুজনের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

মাথা হেলিয়ে হাসল রানী। তারপর পিঙ্কিকে বলল, চল পিঙ্কি, ভেতরে যাই।

মানুষের নিভে যাওয়া মুখ দেখে কখনো রানী আনন্দ পায় নি। আজ পেল। যুগল সেনও জানুক হেরে যাওয়ার কষ্ট। অসফল বেদনা। ধরাধরির লোক না থাকলে কত কিছু থেকেই খামোখা বঞ্চিত হতে হয় জানুক যুগল।

দীর্ঘ লম্বা ডাইনিং কেবিনের ভিতর শীত তুপুরের মিষ্টি রোদ আলো হয়ে জ্বলছে। কেবিনের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ লম্বা টানা টেবিল। কাঠ, কিন্তু পালিশের দৌলতে দামী কাচের মতো ঝক্ ঝক্ করছে টেবিলটা। তেরছা হয়ে নরম রোদ পড়েছে। বাসন্তী রঙের পাতলা সিল্কের পর্দা ফুরফুর করে উড়ছে। দেয়ালে দেয়ালে আটকানো বাহারে ফ্লাওয়ার ভাসে তুলছে তাজা টাটকা শাদা আর মভ রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ক্রিসেনথিমাম।

টেবিলের মাঝখানে স্তূপাকার খাবার সাজানো। তার সুগন্ধে বাতাস ভরে আছে। রানী গালে হাত দিয়ে সবাইকে দেখছিল।

এখন লঞ্চের সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছেন। সারি সারি মুখ। এভাবে মানুষের সারি সারি মুখ পর পর দেখে যাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। সারি সারি মুখ নয়। সারি সারি চরিত্র। কারো রহস্য কিছুটা জানা। কারো রহস্য একেবারেই অজানা। কারো সম্বন্ধে যা ধারণা করা হয়েছে তার সবটাই ভুলভাল ধারনা। এখন ওদের সঙ্গে আরও দুজন বাইরের মানুষ রয়েছেন। দুজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক।

রানীর পাশে বসেছেন সোমেশ্বর রায়চৌধুরী, তাঁর পাশে মালতী-বৌদি। বৌদির পাশে নটরাজন, সঞ্জয় বসু, সুহাসদা আর নূপুরদি। ওপাশে বসেছেন রেবতীপিসি, অজিত পিসেমশাই আর নলিনীপিসি। তাঁদের পাশে দুজন সাংবাদিক—দেবেন মুখার্জি আর চন্দ্রচূড় সান্যাল। তাঁদের পাশে পিঙ্কি আর রাজেশ। আহা, যদি এই টেবিল ভরা এত রকম খাবার, এ সবই যদি যুগল সেন দেখত?

দেবেন মুখার্জি উৎফুল্ল মুখে বললেন, কি অদ্ভুত সব প্রিপ্যারেশন! এত রকম মাছের ব্যাপার, কি হে চন্দ্রচূড, আর কোথাও দেখেছ?

চন্দ্রচূড় সান্যাল কান এঁটো করা হাসি হেসে বলল, নাঃ! সত্যি সোমেশ্বরবাবু, এত আয়োজন কেন?

সোমেশ্বরদা হাসতে হাসতে বললেন, এ সব মাছই কিন্তু যে দ্বীপে আমরা যাচ্ছি সে দ্বীপের জেলেদের ধরা। এই যে পমফ্রেট মাছের ফ্রাই, ম্যাকারেলের ফ্রাই, ভেটকির রোস্ট, চিংড়ির স্টাফ্‌ড প্রিপ্যারেশন—এ সব মাছই নতুন দ্বীপের।

—তাই নাকি। এ সব কখন এলো? অজিত পিশেমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

—কেন? আমাদের অর্ডার দেওয়াই ছিল, ওরা লঞ্চে করে দিয়ে গেল। টাটকা ঝুড়ি ভরা মাছ। মালতীবৌদি উৎফুল্ল স্বরে বললেন।

তিনি নিজে যত না খাচ্ছিলেন তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন খাওয়াতে। পরিবেশকদের বার বার সচেতন করে তুলছিলেন

কার কি লাগবে এই সব বিষয়ে। রানী তাকিয়ে দেখল খেতে খেতে সুহাসদা আর নূপুরদি সমানে নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলে যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী যদি এমন প্রেমিক প্রেমিকার মতো কথা বলে যায় তাহলে বড় দৃষ্টিকটু লাগে। সব সময়ে এভাবে দুজনে যদি খামের গায়ে ডাকটিকিটের মতো সেঁটে থাকে তাহলে তাদের এভাবে সকলের সঙ্গে আসাই উচিত হয় নি।

নূপুরদির ওপর রানীর এত রাগ হচ্ছিল যে এমন কি নূপুরদিকে রানীর আর দেখতেও ভালো লাগছিল না। সে মনে মনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, নূপুরদি, তুমি আমার বাঁচাব ব্যবস্থা করতে পারো না, কেবল আমার মৃত্যুই কেড়ে নিতে পারো! নূপুরদি তুমি কী নিষ্ঠুর!

সামনে তার লতাপাতা কাটা প্লেট। শানানো কাঁটা চামচ। প্লেটে স্তূপাকার হয়ে আছে খাবাব। এত সুস্বাদু যে বানী না খেয়েই পারছিল না। আহারের স্বাদের লোভ রানী কিছুতেই সামলাতে পারছিল না। অথচ রানী ···

এই রানীই অপেক্ষা করে আছে। কখন 'রাজেন্দ্রানী' ঘোলা জলের রাশি কেটে আস্তে আস্তে ঘন নীল হয়ে যাবে। তখনই নূপুরদিকে দেখানোর সময়। সে নূপুরদিকে ঠিকই দেখিয়ে দেবে যে তার ওই সরু শিশিটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেও সে ভয়ঙ্কর ভাবে এই পৃথিবীর সমস্ত হৃদয়হীন হিসেবী মানুষদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারে।

নূপুরদি আর সুহাসদার মধ্যে কি সত্যিই কিছু হয়েছে?

ওপাশে রাজেশ আর পিঙ্কি দুজনে একমনে একটা ট্রানজিস্টার শুনছিল খুব নীচু ভলিয়্যুমে। বোধ হয় দুপুরের ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের প্রোগ্রাম। আজই সকালে তাদের দেখা হল। প্রথম দেখা। অথচ দুজনকে এত নিমগ্ন এত পরস্পরের প্রতি আসক্ত লাগছিল, যে রানী কিছুটা অবাক হলই।

রেবতীপিসি খুব চেষ্টা করে করে কথা বলছিলেন নলিনীপিসির

সঙ্গে। মাঝখানে অজিত পিশেমশাই থাকলে বেশি কথা বলবার আর দরকারই পড়ছিল না। আর সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদি তো দুজনে মিলেই একশো।

কিন্তু তার মধ্যেও রানী লক্ষ্য করছিল মালতীবৌদি নটরাজনকে আলাদা এ্যাটেনসন দিচ্ছেন। বরং রাজেশের একজন বন্ধু সঞ্জয়,—সঞ্জয় বসু কিছুটা চুপচাপ কিছুটা একা পড়ে গিয়েছিল।

রানী কারো সঙ্গেই তেমন কোন ব্যক্তিগত কথা বলতে পারছিল না। কারণ তার পাশেই সোমেশ্বরদা। এমন রূপবান বিত্তবান পুরুষকেও রানীর ক্রমশ কি রকম অদ্ভূত লাগতে আরম্ভ করেছে। এত বেশি একস্ট্রোভার্ট মানুষ তার পছন্দ নয়। প্রতিটি চাল নিখুঁত, চলন নিখুঁত, কথাবার্তা সব নিখুঁত। সম্ভবত আয়-ব্যয়ের হিশেব-নিকেশ তাও নিখুঁত কিংবা ইন্‌কাম ট্যাক্সের রিটার্ণ। তা সত্বেও রানীর কেমন যেন সন্দেহ হয়। মন্দির যত দীর্ঘ হয়, তার ছায়া তত দীর্ঘ হয়ে পড়ে। কিন্তু সোমেশ্বরদার ছায়া কই?

রানী সোমেশ্বরদার ত্রুটি দেখতে চায়, দুর্বলতা দেখতে চায়। আহা, সেই সুখিয়া এলো না কেন? কিংবা মেলার ভিড়ে সোমেশ্বরদা কেন তাকে···

সোমেশ্বরদা সবাইকে নতুন দ্বীপের কথা বলছিলেন।

—আমার এই নোয়ার আর্ক যাচ্ছে এক নতুন পৃথিবীতে। হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। দ্বীপটার কথা বিশেষ কেউ জানে না। জায়গাটা আপাতত সভ্যতা থেকে কিছু দূরে।

আজই কলকাতা থেকে আমাদের শেষ রসদ আনা হয়েছে। কাল, রেডিও ছাড়া বলতে গেলে আমরা কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন। কাল রাতে আমরা রওনা হব। ভোরে নামখানায় পৌঁছাব হয়তো।

কেবল একটি ছোট লঞ্চ, সেটিকে আমরা আলির লঞ্চ বলি, নামখানায় যাবে ভালো মিষ্টি জল আনতে। কাল ভোরে আমরা যখন নতুন দ্বীপের কাছের নীল সমুদ্রে নোঙর করব, তখন ফিরে আসবে।

মালতীবৌদি হেসে বললেন, স্যরি পিঙ্কি তোমাকে দু'দিন তাজা কেক খাওয়াতে পারব না।

পিঙ্কি শুনতেই পেল না মালতীবৌদির কথা। এত নিবিষ্ট সে আর রাজেশ। সেদিকে সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে যেতেই একটা হাসির রোল উঠল। রাজেশ চমকে তাকিয়ে পিঙ্কিকে সচেতন করে দিতেই পিঙ্কি মুখ তুলে বলল, আমাকে কিছু বলছ বউদি?

রানী দেখল শাদা হাল্কা অর্গাণ্ডি আর লেশের ম্যাক্সি পরা পিঙ্কির মুখখানি কেমন বর্ণহীন শাদা। পিঙ্কি অত ফরশা, তবু কেন খামোখা কতগুলো পাউডার মেখেছে? কে জানে!

সোমেশ্বরদা বললেন, পিঙ্কি ফ্রেশ কেক নাই বা পেল, নতুন দ্বীপের টাটকা মাছভাজা খেয়ে ব্রেকফাস্ট করবে, তাই না পিঙ্কি?

পিঙ্কি অল্প হাসল।

সোমেশ্বরদা বললেন, সত্যি, আমাদের ধলভূমগড়ে বনের মধ্যে পিকনিক করতে গেছি। ও মা, পিঙ্কি দেখি একদল সাঁওতাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে জুটে গিয়ে তাদের সঙ্গে মনের আনন্দে কন্দ আর মেটে আলু পোড়া খাচ্ছে।

পিঙ্কির দিকে সবাই তাকিয়ে দেখল সে আবার তাঁদের কারো কথা শুনছে না। মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে শুনছে ট্রানজিস্টারটা। রাজেশও তার সঙ্গে মাথায় মাথা মিশিয়ে দিয়েছে।

তখন খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বেয়ারা দই আর পুডিং দিচ্ছে। হঠাৎ পিঙ্কি উঠে দাঁড়াল। সে অদ্ভুত টলছে। রাজেশও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। জড়িয়ে ধরে রাখল প্রায়। নাহলে হয়তো পিঙ্কি পড়ে যেত। পিঙ্কিকে ধরে ধরে রাজেশ চেয়ারের জাল পেরিয়ে দরজার পাশে নিয়ে গেল।

টেবিলের সবাই খাওয়া ফেলে ওঠে আর কি! মালতীবৌদি বললেন, আপনারা উঠবেন না, উঠবেন না। বসুন সবাই। পিঙ্কির বোধ হয় একটু শরীর খারাপ করেছে।

সোমেশ্বরদা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, ওকে কি বেশি জিন এ্যাণ্ড লাইম খাইয়ে দিয়েছ নাকি তোমরা ?

মালতীবৌদি উঠতে উঠতে বললেন, না, না, আমার মনে হয়, বেচারীর বেশি রোদ-টোদ লেগে পিত্তি পড়ে গেছে বোধ হয়। অভ্যেস তো নেই।

রাজেশ বলল, আপনারা খান, ব্যস্ত হবেন না, কিছু হয় নি পিঙ্কির, আমি ওকে ওর কেবিনে নিয়ে যাচ্ছি।

মালতীবৌদি বললেন, ওর কেবিনে নয়। ওর কেবিনটা একটেরে মতো; আলাদা। চল রাজেশ, ওকে আমাদের কেবিনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিই।

মালতীবৌদিও রাজেশের সঙ্গে চলে গেলেন।

সবাই নিঃশব্দে শেষ কোর্সগুলো খাচ্ছিল। রানী পুডিঙের টুকরো চামচে ভাঙতে ভাঙতে গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। যে পায়, সে কি সবই পায়। রাজেশের কালো নিবিড় দুটি চোখে রানী গভীর উৎকণ্ঠা আর আন্তরিক স্নেহ লক্ষ্য করেছে। পিঙ্কির স্বামী ভাগ্য ভালো।

মালতীবৌদি ফিরে এসে খেতে বসলেন। বললেন, ও কিছু না। ওই আমি যা বলেছি। রোদের তাত লেগে অমন হয়েছে। গা গোলানো মাথা ধরা। এ্যাস্পিরিন দিয়ে এসেছি, ওকে। রাজেশ মাথার কাছে বসে আছে। কোন চিন্তা নেই। আপনারা খাওয়া শেষ করুন।

কিন্তু ডাইনিং কেবিনের আড্ডা আর তেমন জমল না।

সোমেশ্বরদার নির্দেশ ছিল, ঠিক লাঞ্চের পর 'রাজেন্দ্রানী' ছাড়বে। খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে নিজের কেবিনে যেতে যেতে রানী শুনতে পেল 'বাজেন্দ্রানী'-র জেগে ওঠা হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ আওয়াজ।

নলিনীপিসি কেবিনে গিয়ে নিজের বিছানায় শুলেন। রানীও ভাবল একটু শুয়ে পিঠের ব্যথাটা ছাড়িয়ে নেবে। সত্যি, এ কথা

ঠিক, বিস্তর ঘোরাঘুরি হয়েছে আজ সাগরদ্বীপে। কেবিনটার ঝাঁপ-টাঁপ ফেলে বেয়ারারা আধো অন্ধকার করে দিয়ে গিয়েছিল। ঘরের নো-অডর-এর কৃত্রিম স্প্রের গন্ধ উড়ে গিয়ে এখন ভাসের এক-গুচ্ছ তাজা রক্তগোলাপের সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে।

নলিনীপিসি বললেন, রানী, সাগরমেলায় না এলে—সত্যি আমার জীবনের অনেক দেখাই বাকি থেকে যেত।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে রানী বলল, তা সত্যি। আচ্ছা, নলিনীপিসি, ওদেশে আপনি দুপুরে নিশ্চয়ই ঘুমোতেন না?

—নাঃ। চাকরি করতে হত। তবে না করলেও চলত। অবশ্য আমার দ্বিতীয় বিয়ের পর কিছু দিন আমি চাকরি করি নি। বাড়িতেই থাকতাম। প্রায় হাউস-ওয়াইফই বনে গিয়েছিলাম।

রানী অকস্মাৎ বলে উঠল, আচ্ছা নলিনীপিসি, আপনার কখনো স্যুইসাইড করার ইচ্ছে হয়েছে? বলেই মনে পড়ল প্রশ্নটাকে সকালেও একবার রানীকে করেছিল।

নলিনীপিসির আবছা ছায়া শরীর থেকে আওয়াজ উঠল, হ্যাঁ, হয়েছে রানী!

ঘুমপাড়ানি গানের মতো লাগছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। —ম্যাক্সকে ছেড়ে যখন স্টেটস-এ চলে এলাম তখন সামার। আমি একটা ছোট্ট একঘরের ফ্ল্যাট নিলাম। এতটুকু একটা কিচেনেট সমেত। আর একটা পড়ানোর চাকরি। তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কেবল কাজ আর কাজ। কেমন অদ্ভুত প্রাণহীন ছকে বাঁধা জীবন হয়ে উঠেছিল। সকালে ওঠা। ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাজে যাওয়া। কাজ থেকে ফিরে এসে ফ্ল্যাটে থাকা। একা একা টি-ভি দেখা কিংবা মাঝে মাঝে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে উইণ্ডো ড্রেসিং দেখা। ক্রমশ শীত পড়ে এলো। শীতে চারিদিক কেমন ভুতুড়ে হয়ে উঠল। বরফে ভরে গেল চারিদিক। ওদেশে জানো তো সবচেয়ে বেশি স্যুইসাইড হয় শীতকালে। প্রকৃতিই এমন হয়ে যায় যে মানুষের

মন বদলে যেতে থাকে হয়তো। আমিও কেমন যেন একঘেয়ে বোধ করছিলাম। নির্বান্ধব লাগছিল।

রানী বলল, কেন? তখন এখানে রেবতীপিসির কাছে চলে এলেই তো পারতেন।

নলিনীপিসি বললেন, ছাখ রানী, তুমি ছেলেমানুষ। তাই বুঝতে পারবে না। মানুষ যখন হেরে যেতে থাকে তখন তাকে ভূতে পায়। তার কাণ্ডজ্ঞান সব চলে যেতে থাকে। ভালোমন্দের বোধ থাকে না। কেবল একটা দিকেই তার সমস্ত ইচ্ছে চলে যেতে থাকে। আমারও তেমনি হয়েছিল।

আমার কলেজেও বিশেষ কারো সঙ্গে কথা বলতাম না। গ্রুমি হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা বরং পার্টিতে ডাকত গেট্-টু-গেদারে ডাকত। আমি যেতাম না। গোঁজ হয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে আসতাম। শনিবার আর রবিবার আমার ছুটি। ওদেশে ওরা উইক-এণ্ডে কত আনন্দ করে। বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

আমি সেই যে শনিবার এসে ঢুকতাম তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুলতাম সেই সোমবার সকালে। এমন কি নিউজ পেপার কিনতেও বেরোতাম না। অর্ধেক দিনই খেতাম না কিছু। স্নানও করতাম না। ঠিক দুষ্টু বাচ্চাদের মতো বলতে পারো। খাইয়ে দিলে খাব, স্নান করিয়ে দিলে স্নান করব। এমনি একটা ভাব আর কি।

এমনি সময় ঘোরতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লাম। অবশ্য জোরালো ওষুধ-টষুধ খেয়ে যথারীতি চাপা দিলাম ব্যাপারটাকে। শরীরটা কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও।

সেই সময় একদিন এক গেলাস জলে ঘুমের ওষুধের একটা ফেটাল ডোজ গুলে নিলাম।

রানী চমকে উঠল—ঘুমের ওষুধ!

—হ্যাঁ রানী। অন্য আর কোন ভাবে স্যুইসাইড করার সাহস ছিল না আমার। মনে আছে বিছানায় শুয়ে পাশের

টেবিলে গেলাশটা রেখে, নিজেকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিলাম।

রানী সাগ্রহে বলল, তারপর?

—তারপর? একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। কি আশ্চর্য, কত দিন বাদে হঠাৎ তখনই আমার ফ্ল্যাটের দরজার বেল বেজে উঠল। উঠে গিয়ে খুলে দিলাম দরজা। ভেবেছিলাম কোন ক্যানভাসার-ট্যানভাসার হবে। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এরিক। কলেজে আমার ডিপার্টমেন্টের কোলিগ।

এরিক আমার খোঁজ নিতে এসেছে। তার দু'চোখে উৎকণ্ঠা।

আমি এরিককে ঘরে নিয়ে এলাম। এরিক বলল, নলিনী, আমার মনে হচ্ছিল তুমি খুব বিপদের মধ্যে আছ। তিনদিন কলেজে যাও নি। কিন্তু···

এরিকও একা একা থাকত। হয়তো কোন ফিলিংস হয়েছিল ওর। অমন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটেও।

রানী বলল, তারপব?

—তারপর এরিকের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমরা খুব সুখে ছিলাম রানী। অনেক দিন বড় সুখে ছিলাম। ঘর সংসার স্বামী শান্তি। চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কেবল চাইতাম এরিককে খুশি করতে। আমাদের দুজনের কেবল একটাই দুঃখ ছিল। আমাদের কোন সন্তান ছিল না। আমরা ঠিকও করেছিলাম কোন অনাথ বাচ্চাকে নিয়ে এসে মানুষ করব। কিন্তু ইতিমধ্যে—

—কি হল নলিনীপিসি?

—এরিকের পেটে ক্যানসার হল। মারা গেল এরিক।

রানী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে বালিসে মাথা হেলিয়ে শুয়ে পড়ল!

খানিকটা শুয়ে থাকার পর রানীর খুব ইচ্ছে হল দুপুরের সমুদ্র দেখার। উঠে বাইরে গেল সে। লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়াল।

সাগরদ্বীপের হাল্কা একটু রেখা মাত্র দূরের আকাশ আর সমুদ্রের সীমানায় ফুটে আছে। চারিদিকের জলের রং গাঢ় শ্লেটের মতো। তাতে রোদ জ্বলছে আর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ছোট ছোট ফেনার শাদা রেখা ফুটে ফুটে উঠছে।

সাগর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে, বিলীয়মান সাগরদ্বীপ দেখতে দেখতে স্বরাহীন ভাবে রোদে পিঠ দিয়ে এই দাঁড়িয়ে থাকা। চোঁখে ঈষৎ ঝিম্-ঘুম। হাওয়ায় আঁচল উড়ছে। মাথার ভিতর নতুন অভিজ্ঞতার স্মৃতি। জলেব ওপব পড়া ছায়াব মতো, তার লম্বা দীর্ঘ সময়।

একঝলক সেন্টের সুগন্ধের সঙ্গে নূপুরদি ঝলমলে সাজ নিয়ে এসে দাঁড়াল রানীব পাশে।

—কি রে, কি দেখছিস? সমুদ্র?

—সমুদ্র কি এই রকম দেখতে নূপুরদি?

—না বে, এ বকম ঠিক না। যে দেখে নি তাকে সমুদ্র বোঝানো যায় না। কালই বুঝবি সমুদ্র কী।

দুই বোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। খানিক বাদে নূপুরদি বলল, বানী, তোকে একটা কথা বলতে এসেছি।

—কিগো নূপুরদি?

নূপুরদি হেসে বলল, শোন, তুই যতটা সরল সেজে থাকিস, ততটা সবল তুই আসলে নোস্। বুঝলি মুখপুড়ি!, শোন, আমি সব জানি। তোর সুহাসদা আমাকে সব বলে দিয়েছে।

—তাহলে যে আমাকে বললেন, বলেন নি তোমাকে কিছু!

—নাঃ, ও আগে বলে নি। আজই বলেছে। সকালে। তোর নামে লাগাবে বলে বলে নি। অন্য প্রসঙ্গে বলেছে।

বানী সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল নূপুরদি একটুও রাগ করে কথা বলছে না। বরং খিল্‌খিল্ করে হাসছে।

নূপুরদি রানীর পিঠে সেই ছোটবেলার আদরের একটা ছোট্ট কিল মেরে বলল, শোন, তোকে সবচেয়ে আগেই খবরটা

দিই। আমি আর তোর সুহাসদা আর একসঙ্গে থাকব না ঠিক করেছি।

—সে কী! রানী চমকে উঠল।

—হ্যাঁ! এ ব্যাপারে সুখাপুখরিয়া থেকে গাড়ি করে কলকাতায় আসতে আসতে আমরা ডিস্‌কাস্ করে ফেলেছি ঠাণ্ডা মাথায়।

আর যতক্ষণ আলাদা না হওয়ার ব্যাপার ছিল, ততক্ষণ রাগ ঝাঁঝ এ সব ছিল। এখন তো সে সবের আর কোন অবকাশ নেই, সুতরাং দিব্যি বন্ধু হয়ে গেছি আমরা।

আমরা দুজনে কি ঠিক করেছি জানিস? আজ নতুন দ্বীপে জেলেদের ঘরে রাত কাটাব। দারুণ রোমান্টিক আইডিয়া। না রে? ভাগ্যিস এখনো ছেলেপুলে হয় নি আমাদের। তাহলে কি প্রবলেম হত বল্। তবে একটা ভয় আছে। ওদের বাড়ির সবাই দুঃখ পাবে। আমার বাবা মা-ও দুঃখ পাবে। কিন্তু মুখপুড়ি তুই···

রানীর চুল ধরে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুই মুখপুড়ি, তোর সুহাসদাকে বলবি তোকে যত ইচ্ছে চুমু খেতে।

রানী সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, আঃ, আর কিছু বলবে না আমায় নূপুরদি। আমার কান পুড়ে যাচ্ছে।

নূপুরদি সমানে হাসছিল। ক্রোধহীন সহৃদয় হাসি। রানী হাঁটু গেড়ে নূপুরদির সুগন্ধি শাড়ি-মোড়া দু'হাঁটুর ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, নূপুরদি, নূপুরদি, আমি বড় খারাপ। মহলা নোঙরা। আমায় তুমি শাস্তি দাও। কিন্তু আমার দুর্বলতার জন্যে তোমরা আলাদা হয়ে যেও না। আমি তাহলে মরে গিয়েও শান্তি পাব না।

—মরতে তোমায় দিচ্ছে কে? নূপুরদি হাসল।

রানী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, নূপুরদি, আমিও জানি, ঘুমের বড়ির শিশিটা তোমার কাছে।

নূপুরদি চমকে উঠল।—কি করে জানলি?

—নূপুরদি বিশ্বাস কর, সুহাসদার কোন দোষ নেই। সুহাসদা

কেবল আমায় দয়া করেছিল। আমার দুঃখের সময় সঙ্গ দিয়েছিল। তার বেশি কিছু না।

নূপুরদি বলল, ওরে পাগল, আমি সব জানি রে। আমার স্বামীকে আমি চিনি না? তুই কি যে বলিস! ও সব কথা তোকে ঠাট্টা করে বলছিলাম। তোর ব্যাগের চিঠি দুটোয় আমি চোখ বুলিয়েছি। আমি জানি সুহাসের সম্বন্ধে তোর কোন রকম দুর্বলতা নেই।

রানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। নূপুরদি বলল, আমাদের আলাদা হওয়ার কারণ তুই নোস রানী। দুঃখ করিস না।

—তবে? তবে কে?

—সে আর একজন। তা সে আর যে-ই হোক, আমরা দুজন কি ভালো অভিনয় করে যাচ্ছি বল! কেউ বুঝতে পারে নি। দুদিন বাদে ঠিক বুঝবে। তখন বেশ মজা হবে। তাই না?

রানী বলল, তোমার বুঝি এই ধারণা নূপুরদি? বাঃ বেশ! তুমি জানো সোমেশ্বরদা ব্যাপারটা দিব্যি বুঝেছেন? মালতীবৌদিও!

নূপুরদির মুখটা একবারে কাগজের মতো শাদা হয়ে গেল। সে বলল, সে কী রে! কি বলছিস তুই!

—হ্যাঁ, ওরা সুহাসদার সঙ্গে তোমার দু-চারটে কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে। তুমি নাকি বলছিলে তুমি অনেক দিনের মতো ঘুমিয়ে পড়বে-টড়বে। এ সব বলেছিলে সকালে চায়ের সময়। তাছাড়া ওই ঘুমের বড়ির শিশিটাও জানবে আর তোমার কাছেও নেই। তোমার ব্যাগ থেকে ঠোঁটে লাগাবার ক্রিম বের করতে গিয়ে মালতী-বৌদি ঘুমের বড়ির শিশিটা দেখতে পেয়ে সোজা তুলে নিয়েছে!

রানীর কথা শুনে নূপুরদি আস্তে আস্তে শক্তিহীন উঠে দাঁড়াল। রানী নূপুরদির আঁচলটা টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল, এবার বল 'আর'-কে?

নূপুরদি ক্লান্ত গলায় বলল, 'আর', সুহাস যখন কলকাতায়, কনফারেন্সে, তোর সঙ্গে,—তখন সুখাপুখরিয়া যে আমায়......সে

নূপুরদি মুখ তুলে তাকাল জলের দিকে।

—কে সে? আমায় বল নূপুরদি? বল লক্ষ্মীটি!

রানী দেখল নূপুরদির চাঁদের মতো ফরসা আর গোল কপালে কাঁপছে গুঁড়ো গুঁড়ো চুল। জোড়া নিবিড় ভ্রূর তলায়, টানা টানা অতল ছুটি চোখ। গলায় চিক্‌চিক্ করছে সোনার চওড়া পাটি-হার। হারের তলায় বড় গলার ব্লাউজের উপরের অনাবৃত অসমতল, গেরুয়া সাটিনের মতো ত্বক। নূপুরদি অদ্ভুত তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'আর' হল রঞ্জন! সে—সে আমার কুমারী বয়সের পাপ।

রানী জানতো বি. এ, পাশ করবার পর খুব ঘটা করে দেখেশুনে, পাল্টি ঘরে নূপুরদি আর সুহাসদার বিয়ে হয়েছিল। বছর পাঁচেক হল। বিয়ের সময় কি আলো শানাই জাঁকজমক খাওয়া-দাওয়া। নূপুরদি একমাত্র মেয়ে। শাড়ি-গয়না আসবাবপত্রর যেন দোকান সাজিয়ে দিয়েছিল রেবতীপিসি। রানী তখন পনেরো ষোল বছরের মেয়ে। হোস্টেল থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিল নূপুরদির বিয়ের খাওয়া খেতে। এত শাড়ি গয়না দেখে সে একেবারে বিমুগ্ধ!

কিন্তু কই, তখন তো নূপুরদিকে কিছুমাত্র প্রেমকাতর মনে হয় নি রানীর। বরং বেশ তো গদগদ লাগছিল! অমন সুন্দর সুপুরুষ কোয়ালিফায়েড স্বামী পেয়ে দিব্যি খুশি খুশি। বাসর ঘরের দু-চারটে রসিকতাও মনে পড়ে যাচ্ছে এখন রানীর।

অথচ আজ, এই অদ্ভুত দুপুরে, ডেকের ওপর বসে রানী নূপুরদির কুমারী বয়সের পাপের গল্প শুনছে।—

সুখাপুখরিয়া নূপুরদির ভালো লাগে না। নতুন গড়ে উঠছে ইনডাসট্রিয়াল শহরটা। মাটি ফুঁড়ে এখন যেটুকু চেহারা ফুটে বেরিয়েছে, সেটা শহর নয়। নিতান্তই সাইট্। কেবল ধূলো আর বুলডজার একদিকে। আর একদিকে এক বিরাট কম্‌প্লেক্স, আর একদিকে কর্মীদের কোয়ার্টারের কঙ্কাল মাথা তুলছে। যখন সুখাপুখরিয়া পুরো গড়ে উঠবে তখন এই প্ল্যান্‌ড্ সিটি হয়ে উঠবে

গাঢ় সবুজ। পার্ক, প্রমেনেদ, আইল্যাণ্ড দিয়ে। এমন ব্যবস্থা। কিন্তু আপাতত সেই সব ঝাউ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, পারুল, সোনাঝুরি আর অমলতাসের চারাগুলো একফুটেরও বেশি নয়।

সাইটে যারা কাজ করছে, তাদের মধ্যে এখনো অনেকেই ফ্যামিলি আনে নি। নূপুরদির কোয়ার্টারে বড় লন, কিচেন গার্ডেন আছে। কিন্তু ধূলোয় রোদের হল্কায় সেখানে ঘাসের একটা শিষও বাঁচানো দায়। সেই রোদে ঝল্‌সানো বান্ধবহীন সুখাপুখরিয়ার নূপুরদির জীবন একা—অসহ্য। নূপুরদিকে আনন্দ দেবার জন্যে অবশ্য সুহাসদা তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসত কিংবা কাছাকাছি বড় শহরে সিনেমা দেখাতে কিংবা ক্লাবে নিয়ে যেত। কিন্তু সুহাসদার কাজের চাপও খুব বেশি। নতুন করে যখন প্লান্ট বসানো হয়, তখন যেমন খাটতে হয়। সুহাসদার ইচ্ছে থাকলেও ফুরসৎ মিলত না তেমন।

তখনই এসেছিল রঞ্জন। নূপুরদির সেই কুমারীকালের ভুলে যাওয়া প্রেমিক। পাশের বড় শহরে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে। সুহাসদার সঙ্গে লতায়-পাতায় কি একটা সম্পর্কও বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রে আবার আসা যাওয়া। রঞ্জন তখনো বিয়ে করে নি। সে একা। তার কাজের চাপও ছিল হাল্কা। এবং তার একটা গাড়িও ছিল। তারপর যা যা ঘটবার তাই-ই ঘটে। পুরোনো ভালোবাসা। একাকীত্বের ক্রমাগত সুযোগ। সুহাসদার অগাধ আস্থা। আর দুটি মানুষের ক্রমাগত মেলামেশা ঘোরা বেড়ানোর ফলে শরীরের আকর্ষণ। পাপ। পাপের ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন, নূপুরদি আর রঞ্জন বিশ্বাসঘাতকতার ঢালু রাস্তা বেয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত সুহাসদার আন্তরিকতা, পবিত্রতার কাছে নূপুরদি এমন ভাবে হেরে যেতে থাকে যে, সুহাসদার কাছে একদিন সব স্বীকার করে বসে। সুহাসদা সব শুনে বলেছিল, তা সত্বেও তারা একসঙ্গে থাকবে। এমন করে তো কত স্বামী-স্ত্রীই থাকে। এই ভুল, এই দুর্বলতা সুহাসদারও হতে পারত! নূপুরদি কি তখন সুহাসদাকে ফেলে দিত?

কিন্তু ক্রমশ সুহাসদার মনে একটা ধারণা জন্মাতে লাগল। তার মনে হতে লাগল যে নূপুরদি হয়তো নিজের মনকে বুঝতে পারছে না। সে রঞ্জনকেই ভালোবাসে। তাদের দুজনের তো আর ভালোবাসার বিয়ে নয়। আপনা থেকে সম্বন্ধ নয়। সম্বন্ধ করে বিয়ে। সুতরাং সুহাসদা চায় নূপুরদিকে মুক্ত করে দিতে।

—ওর ধারণা কি জানিস? ডিভোর্স হয়ে গেলেই আমি রঞ্জনকে বিয়ে করব।

—তা তুমি যদি রঞ্জনকে ভালোই বাসো তো তাকে বিয়ে কর না। ভালোই তো।

—আমি রঞ্জনকে ভালোবাসি না।

—বাসো না?

—না। আমি সুহাসকেই ভালোবেসে ফেলেছি।

—তাহলে তুমি—

—তুই তো সুহাসের সঙ্গে ড্রিংক করেছিস, পুরুষের চুমু কি তাও জেনেছিস, তা বলে কি যুগল সেনকে ভুলে তুই সুহাসের সঙ্গে কোন রিলেশন গড়তে চেয়েছিস? বল্?

—তাহলে তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট করে সুহাসদাকে বল।

—না, তা আমি বলতে পারব না। আমার বলবার মুখ নেই রানা। আমি শুধু ঘুমোতে চাই। আমি যাই। যে করে হোক, মালতীবৌদিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘুমের ওষুধের শিশিটা আদায় করতেই হবে আমাকে!

নূপুরদি উঠে চলে গেল।

রানী একবার নূপুরদিকে বলতে গেল ঘুমের বড়ির শিশিটা এখন মালতীবৌদির কাছে নেই। আছে সোমেশ্বরদার কাছে। কিন্তু কি ভেবে যেন রানী আর কিছু বলল না। সে একা ডেকের ওপর বসে রইল। 'রাজেন্দ্রানী' সাগরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে

হঠাৎ রানার পিঠের ওপর একটা ছায়া উবুড় হয়ে পড়ল।

উগ্র পুরুষালী ছায়া। ঈষৎ সুগন্ধ আর স্বেদ আর সিগারেটের ধোঁয়ার হাল্কা গন্ধ উঠল চারিদিকে। রানী ফিরে তাকিয়ে দেখল তার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে নটরাজন। কালো পাথরের তৈরি মূর্তির মতো দেখতে নটরাজন। দাঁতগুলি আশ্চর্য উজ্জ্বল আর শাদা।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ সকাল থেকেই। এই এতক্ষণে সুযোগ মিলল।

রানী হেসে বলল, বাঃ, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

নটরাজন রানীর পাশে এসে একটা উঁচু কাঠের বেদীতে বসল।

—তবে যে রাজেশ বলে আমাব কথায় এখনো টান আছে?

—তা আছে, কিন্তু বাংলাটা তো নিখুঁত।

নটরাজন চুলের ফাঁকে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, আমার বাবা কলকাতায় বহুদিন পোস্টেড ছিলেন। রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে জন্ম থেকে চোদ্দটা বছর কেটেছে। তারপর আমরা তামিলনাদে ফিরে যাই।

রানী বলল, ও, তাই আপনার ভাষা এত সুন্দর।

—তবে বহুদিন বাংলা বলি নি। নীলগিরিতে আমি আর রাজেশ ছুজনে একসঙ্গে পোস্টেড হবার পর আবার বাংলা বলার সুযোগ পেলাম। বহুদিন পরে বাংলায় এলাম। কলকাতা যে কত বদলে গেছে!

রানী বলল, আপনি নীলগিরিতে থাকেন? একা?

—হ্যাঁ, আমাদের ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার। পাশাপাশি থাকি আমি আর রাজেশ।

—নীলগিরি নামটা কি সুন্দর!

—জায়গাটাও আশ্চর্য সুন্দর। জানেন, আমি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছি। কিন্তু নীলগিরির মতো এত সুন্দর জায়গা আমি আর দেখি নি!

—সত্যি, আমাকে একটু বলুন না নীলগিরির কথা!

নটরাজন হাসল। ভারী সুন্দর সুরেলা কণ্ঠস্বর তার।

—ও ভাবে আবার নিজের ভালো লাগার কথা বলা যায় নাকি? যদি কখনো সুবিধা হয় বরং আপনাকে নিয়ে যাব। পিঙ্কি আর রাজেশের বিয়ের পরই তো আপনি নীলগিরি যেতে পারেন

রানী হাসল। —সত্যি, আপনি ঠিকই বলেছেন। ও ভাবে বলা যায় না। আমি কি কাউকে বলতে পারব সাগরদ্বীপ, মেলা আমার কেমন লেগেছে? বলা যায় না। সত্যি।

নটরাজন বলল, সকাল বেলা আপনাকে যখন প্রথম দেখলাম, তখনই এত জানতে ইচ্ছে করছিল আপনার কথা, কি বলব!

—সত্যি?

—হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল আপনার মধ্যে যেন অনেক কথা জমে আছে। আপনি কাউকে কিছু বলবেন না ঠিক করে মনের মধ্যেই জমিয়ে রেখেছেন।

রানী নটরাজনের দিকে অবাক হয়ে তাকালো। নটরাজনকে সে ঠিক এমনটা ভাবে নি।

নটরাজন বলল, আর আমাকে প্রথম দেখে আপনার কি মনে হল?

রানী আড়চোখে নটরাজনের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি কথা বলব?

—বলুন না—

—আপনাকে দেখলেই আমার কেমন ভয় করে ওঠে!

মাথা হেলিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল নটরাজন।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার চেহারার মধ্যে কি যেন একটা ব্যাপার আছে। মেয়েরা সহজে আমার কাছে আসতে চায় না।

—সে কী! তাহলে মালতীবৌদি?

নটরাজন ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত ভাবে রানীর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখুন, যে আমায় যে চোখে দেখে আমিও তাকে তার সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিটাই ফিরিয়ে দিই। আমি শ্রীরঙ্গনাথজীর দেশের লোক কিনা।

—রঙ্গনাথজী?

—হ্যাঁ, আমাদের ত্রিচিনোপলিতে যাবেন। তাঁকে দেখাব। অনন্ত নাগের ওপর শুয়ে থাকা কালো কষ্টীপাথরের বিরাট পুরুষ। তাঁর অনেক রানী অনেক দেবী। কিন্তু তা সত্বেও তিনি তাঁর কোন প্রেমিকাকেই খালি হাতে ফেরান নি কখনো। একজন কবি অণ্ডাল, তাকেও না, এমন কি একজন মুসলমান তরুণীকেও না। কত রকম যে সব প্রচলিত আছে তাঁর সম্বন্ধে!

অণ্ডাল মালা গেঁথে প্রথমে নিজের গলায় পরে প্রসাদী করে দিয়ে তবে তাঁকে পাঠাতো। একদিন অণ্ডালের বাবা তা দেখতে পেয়ে নতুন টাটকা মালা নিয়ে রঙ্গনাথজীকে পরিয়ে এলেন। রাতে স্বপ্নে এলেন রঙ্গনাথ। বললেন, অণ্ডালের প্রসাদী মালা ছাড়া আমি পরবই না!

রানী মুগ্ধ চোখে নটরাজনের দিকে তাকিয়ে শুনছিল। বলল, ভগবানেরও কত দয়া, ভালোবাসায় কত শ্রদ্ধা, তাই না? অথচ মানুষের কেন হয় না বলুন তো?

নটরাজন বলল, এই যে ঠিক ধরেছি, বলুন। আপনার চোখ দুটি আপনি নিজে তো দেখতে পান না। আপনার চোখে অনেক কথা লেখা আছে। অনেক দুঃখের খবর, অনেক কষ্টের কথা। মানুষ, মানুষের ভালোবাসা। দয়া মায়া মমতা। ও সব আমি কবেই বাদ দিয়ে দিয়েছি জীবন থেকে। ভাবি না। ভেবে কষ্ট পাই না। মনকে শক্ত করে নিয়েছি। আপনি তো আমার চেয়ে ছোট, জীবনকে আর কতটুকুই বা দেখেছেন, তাই এখনো আশা করেন। কষ্ট পান।

রানী হাসল একটু। খুব অপ্রস্তুত হাসি।

নটরাজন বলল, আমার বাবা এ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। তারপর

থেকে দারিদ্র কি জিনিস আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আশা করি এর বেশি কিছু আপনাকে বলতে হবে না ?

রানী বলল, না। দরকার নেই।

—আজ সকালে বালতি ভরা গরম জল হাতে আপনাকে যখন দেখলাম, তখনই বুঝলাম আপনি আমার জাতের। তবে তফাৎ কি জানেন ? আমি দারিদ্রকে টপকে গেছি। আমি এখন ধনীদের দলে। আপনি টপকাতে পারেন নি।

রানী বলল, তাতেই তো আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায়।

নটরাজন বলল, না, হয় না। আমি আপনাকে স্পেয়ার করেছি। সাধারণত সুযোগ পেলে আমি বড় মানুষ নামক ওই অদ্ভুত জাতটার কোন স্ত্রীলোককেই স্পেয়ার করি না।

নটরাজনের উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলোয় অদ্ভুত একটা ঘষার শব্দ হল।

—তার মানে মালতীবৌদিকে...

—ওহ্ শি ইজ এ বীচ—

রানী তাকিয়ে দেখল লঞ্চের অন্য দিক থেকে, বোধ হয় নটরাজনকেই খুঁজতে মালতীবৌদি আসছেন। আবার তিনি আমূল সাজ পাল্‌টেছেন অলংকার সমেত। পাছে নটরাজনের কথা কানে যায়, সে তাড়াতাড়ি চাপা গলায় নটরাজনকে সাবধান করে দিয়ে বলল, চুপ, মালতীবৌদি এদিকে আসছেন।

নটরাজন সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার ভোল্ পাল্‌টে ফেলল। যেভাবে দোকানের ওপর শাটার টেনে দেয় প্রায় সেই ভাবেই। সেই সকালে দেখা একটা লোভী লোলুপ শানানো চেহারা। কিছুটা যৌনতা কিছুটা আকর্ষণ দিয়ে বানানো ভঙ্গী।

—হ্যাঁ আপনাকে কি বলছিলাম যেন, সেই মুসলমান মেয়েটির কথা। মালিক কাফুরের এক পালিতা মেয়ে ছিল। মেয়েটি তরুণী। এবং যবনী। তাকে কেউ রঙ্গনাথজীর একটি ছোট্ট মূর্তি দেয়। সেই

মূর্তিরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল মেয়েটি। তার সারাদিন কাটতো ওই মূর্তি বুকে ধরে। শেষ পর্যন্ত ত্রিচিনোপলীতে এলো সে।

রানী চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখল, মালতীবৌদি পা টিপে টিপে ঠিক যেন শিকারী বিড়ালের ভঙ্গীতে তাদের দিকে এগোচ্ছেন। নটরাজন রানীকে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে এত কী বোঝাচ্ছে তাই জানবার বাসনা।

রানী সাগ্রহে বলল, তারপর ?

—তারপর ? সে বড় মজার ব্যাপার। আমার তো তুর্কনাচারের ওই ফোক্ টেলটা শুনতে সব সময়েই ভালো লাগে। রঙ্গনাথজী চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে তাঁর দেবীদের লুকিয়ে লুকিয়ে সেই তুর্কনাচারের অভিসারে যেতেন। ভাবুন, আমাদের তামিলনাদে জানেন তো তখন ব্রাহ্মিণ ইনফ্লুয়েন্স কি কট্টর ছিল। সেই কত শ-বছর আগে। তাও দেখুন ব্রাহ্মণদের গড যাচ্ছে তুর্কি যুবতীর কাছে।...সবচেয়ে মজা হত যখন অভিসারের পর ফিরে আসতেন রঙ্গনাথজী। তখন দেবীরা রাগ করে মন্দিরের সব দরজা দিতেন বন্ধ করে। রঙ্গনাথজী সারারাত ধরেই প্রায় রানীদের কাছে কাতর অনুনয় বিনয় করতেন দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে ..

রানী বলল, বাঃ, ভারী মিষ্টি ঘরোয়া ধরণের গল্প তো !

নটরাজন বলল, হ্যাঁ, সত্যি। দেবতা, অথচ মানুষের মতো, না ?

রানীর ঘাড়ের কাছে যেন গরম নিশ্বাস পড়ছিল। মনে হচ্ছিল বাঘছোপ দেওয়া শাড়ি পরা মালতীবৌদির হাতের তেলোগুলো যেন নখওয়ালা থাবা হয়ে যাচ্ছে। যেন এখনই অতর্কিতে তার ঘাড়ে পড়ে ঘাড় ভেঙে রক্ত শুষে খাবেন।

হঠাৎ খিল্‌খিল্ হাসিতে ডেক যেন ছেয়ে গেল। রানী আর নটরাজনকে ভান করতেই হল যেন তারা খুব অবাক হয়ে গেছে।

মালতীবৌদি হাসতে হাসতে প্রায় নটরাজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ে বললেন, বাঃ নটরাজন, তোমার যে এত গুণ আছে তা তো জানতাম না। বেশ রসের গল্প বলতে পারো তো ?

নটরাজন মালতীবৌদির দিকে ফিরে বলল, আরে, ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম ওঁকে। আমি হলাম রঙ্গনাথজীর দেশের লোক। আমি তাঁরই পূজারী। তিনি যে যা চায় তাকে তাই দেন। উনি নীলগিরির গল্প শুনতে চাইলেন তাই নীলগিরির কথা বলতে গেলাম। বলতে বলতে রঙ্গনাথজীর গল্প চলে এলো।

—বাঃ, যে যা চায় তাকে তাই দাও, তুমি আমাকে তাহলে কি দেবে নটরাজন?

—আপনি যা চাইবেন!

চপলা বালিকার মতো—নাঃ চপলা বালিকা নয়, ছলনাময়ী কথাটাকে গ্রাম্য করে ঘুরিয়ে বললে যারা হয়, সেই তাদের মতো মালতীবৌদি উচ্ছল হয়ে উঠলেন। এই মালতীবৌদিকে রানী মাঝে মধ্যে চকিতে দেখতে পেয়েছে কিন্তু আলাপ হবার আগেই আবার নিজের ভিতরে ঢুকে মুখোশ পরে ভবিযুক্ত হয়ে গেছেন।

মালতীবৌদি বললেন, ছাখ আমাদের পিছনে পশ্চিমে সূর্য নামছে। ছায়াগুলো কেমন লম্বা হয়ে পড়েছে জলের ওপর। শীতের বিকেল তো, দেখতে দেখতে হঠাৎ সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আর তোমার কি মনে আছে নটরাজন আজ সন্ধ্যায় তোমার লঞ্চে তোমার সঙ্গে আমার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

—পাগল, ও কখনো ভোলা যায়?

—চল তাহলে, আমার, স্যরি আমার নয়, পিঙ্কির কেবিনে আমার সঙ্গে চা খাবে আর সানসেট্ দেখবে চল।

—পিঙ্কি কি এখনো অসুস্থ?

—হ্যাঁ। আজ রাতটা ও আমাদের কেবিনেই থাকবে। আমি ওর কেবিনে। আর তোমরা বোধ হয় রাতে কেউ লঞ্চে থাকছই না।

—সম্ভবত না। সোমেশ্বরদা লোভ দেখাচ্ছিলেন নতুন দ্বীপে নাকি বুনো বরা আছে। শিকারে যাবেন।

—রাতে তুমি যেখানেই যাও, সন্ধ্যেটা ভুলো না, এখন চল চা খেতে……

খানিকদূর হেঁটে গিয়ে নিস্পৃহ স্বরে মালতীবৌদি বললেন, কি রানী! তুমিও আসবে না কি?

রানী একবার নটরাজনের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, নাঃ, আমার এই মিষ্টি পড়ন্ত রোদটা খুব ভালো লাগছে। আপনারা যান। আমি ডেকের ওপর আর একটু দাঁড়াই।

রানী একা একা বসে রাজেন্দ্রাণীর ধক্ ধক্ শব্দ শুনতে লাগল। হু হু করে সাগুবে হাওয়া দিয়েছে। পাশে পড়ে থাকা গায়ের গরম স্কার্ফটা কাঁধের ওপর ফেলে দিল রানী। তারপর তাকালো চারদিকে। এখন কাছে পিঠে আর কোন নৌকো নেই। কোন তীরভূমি নেই। শুধু ডিমের আকাবের দিগ্বলয়। নীল আকাশ আর শ্লেট রঙের জলের মাঝখানে হাল্কা ছাইরঙের সীমারেখা।

কেবল রাজেন্দ্রানী। একা রাজেন্দ্রানী। এত জল, জল শুধু জলের মধ্যে সম্পূর্ণ একা লঞ্চটি ধক্ ধক্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কেবল রানী নয়, যেন সমস্ত লঞ্চটিই নিঃসঙ্গ একটি তরণী!

ছোটবেলা টিচারের কাছে বাইবেলের গল্প শুনেছিল রানী। সৃষ্টি যখন পাপে ভরে গিয়েছিল, ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন প্রবল জলোচ্ছ্বাস। ধ্বংসের জলোচ্ছ্বাস। তার আগে পুণ্যবান নোয়াকে বলেছিলেন—আমি সৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছি। তুমি এমন নৌকা বানাও যাতে যাদের আমি চাই তারা আশ্রয় পাবে।

তারপর এলো জলোচ্ছ্বাস। ভেসে গেল সমস্ত সৃষ্টি। কোথাও কিচ্ছু নেই। কেবল জল।

'জল শুধু জল। দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।'

কত দিন কেটে গেল তারপর। শুধু জল; আর জল। নোয়া পাঠিয়ে দিলেন একটি পাখিকে। পাখি উড়ে গেল দিগন্তের দিকে।

মিলিয়ে গেল দূরে। কিন্তু আবার ফিরে এলো ক্লান্ত ডানায়। বসল এসে নৌকোর মাস্তুলে। হতাশ নোয়া বুঝতে পারলেন এখনো ভূমি জেগে ওঠে নি। কেবল জল আর কেবল জল আর জল। সারা সৃষ্টি ধুয়ে গেছে জলে। ভেসে গেছে।

আবার, আবার কত দিন পর নোয়া আশায় আশায় ছেড়ে দিলেন পাখি। উড়িয়ে দিলেন আকাশে। শেষ পর্যন্ত সে ফিরে এলো। ঠোঁটে তার একটি অলিভ শাখা।

জেগেছে। জেগেছে! নতুন সৃষ্টি জেগে উঠেছে আবার। নোয়ার আর্কে উঠল আনন্দের রোল।

চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে লাগল রানী। ঈশ্বরের এই সমস্ত সৃষ্টি যেন ধ্বংসের জলের উচ্ছ্বাসের তলায় চলে গেছে। কোথাও আর কিছু বাকি নেই। কলকাতা নেই, সাগরদ্বীপ নেই, সমস্ত মাটি মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। অজস্র পাখি উড়িয়ে দিচ্ছে রানী আর বারবার তারা ফিরে আসছে ক্লান্ত ডানায়। বসছে এসে রাজেন্দ্রাণীর মাস্তুলে। যেহেতু কোথাও আর কোন ডাঙা অবশিষ্ট নেই, ঠোঁটে করে কচি সবুজ অলিভ পাতা নিয়ে ফিরে আসছে না আর কেউ!

একা রাজেন্দ্রানী, একা রানী আর সৃষ্টি ডোবা জল। জলের দিকে ক্রমাগত চাইতে চাইতে রানীর মনে সন্দেহটা বদ্ধমূল হয়ে উঠতে লাগল।

দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণ নেমে আসছে। অপরাহ্ণের সঙ্গে নেমে আসছে ক্লিষ্ট কুয়াশা। ছায়াগুলি দীর্ঘতর হয়ে উঠছে ক্রমশ। এতক্ষণে জলের রঙ কিছুটা বদলেছে। নীলের দিকে যাচ্ছে শ্লেট রঙটা। ফিকে হয়ে আসছে গেরুয়া কাদা-গোলা ভাবটা। ক্রমশ ছাই রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার নেমে এসে গুলে যাচ্ছে জলের সঙ্গে। যেন আকাশ থেকেই ঝরে পড়ছে গুঁড়ো।

সূর্য ক্রমশ কমলা হয়ে নেমে যাচ্ছে দিকচক্রবালের দিকে।

ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সোনালী রাঙতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নরম বেগুনী রঙের আভা ফুটে উঠছে আকাশের নীলে। রানীর মনে হল, এখন যদি তাদের হোস্টেলের গানের টিচার কাঁকনদি খুব মন্থর টানে, 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটা গাইত হয়তো রানী গানের স্রষ্টার দয়ায় একটু একটু করে বুঝতে পারতো মুক্তিদাতার দয়া, ক্ষমা কেন চিরযাত্রার চিরপাথেয় হবে? হঠাৎ তার শীতার্ত কাঁধ থেকে খসে যাওয়া গরম স্কার্ফটি আবার জড়িয়ে দিয়ে কাছের আর একটি উঁচু বাক্সে বসলেন নলিনীপিসি। রানী চাদরটা টেনে সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, আপনি দুপুরে কি একটু ঘুমিয়েছিলেন নলিনীপিসি?

—খানিকটা ঘুমিয়েছিলাম। এত 'হেভি' খাই না তো সচরাচর, খুব ভালো লাগল খাবারগুলি। কিন্তু অনভ্যস্ত তো—কথাটা বলে ম্লান হাসলেন নলিনীপিসি।

রানী বলল, নলিনীপিসি, আমরা কি এখন সাগরে?

জলের দিকে তাকিয়ে নলিনীপিসি বললেন, নাঃ, এখনো ঠিক সাগরে নয়।

—আপনি অনেক সমুদ্র দেখেছেন, না নলিনীপিসি?

—দেখেছি, সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী তো সামান্য কথা। কত উপসাগর, মহাসাগর, কত কত নদী। অনেক বেশি, অনেক রকম, অনেক রঙের।

রানী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল নলিনীপিসির দিকে। যেন তাঁর মুখের রেখায় রেখায়, ভাঁজে ভাঁজে, এখনো লেগে রয়েছে, সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর স্মৃতি।

হঠাৎ দুম্ করে রানী জানতে চাইল, আচ্ছা নলিনীপিসি, আপনার সঙ্গে রেবতীপিসির কবে আলাপ হয়েছিল?

নলিনীপিসি বললেন, সেই কোন্ ছোটবেলায়!

—বলুন না, গল্পটা শুনি।

—আমার বাবার ছিল বদলির চাকরি। তিনি মুর্শিদাবাদে মুনসেফ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন বছর আটেক। আমার মনে আছে, আমাদের মস্ত কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়িটা ছিল এক বিরাট মাঠের ওপর। মাঠ পেরিয়ে উঁচু রাস্তা চলে গেছে আমবাগানের দিকে। রাস্তার দুপাশে কেবল আমবাগান। পোড়ো বাড়ি আর কিছু কিছু জঙ্গল হয়ে যাওয়া আমবন।

পোড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আর আমবাগানের নির্জনতা আমায় যেন টানত। আমি প্রায়ই একা একা ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম।

মনে আছে একদিন কালবৈশাখী ওঠা বিকেলে আমি একা একা উঁচু রাস্তা দিয়ে ছুটছিলাম। বৈশাখী হাওয়ার উল্টো দিকে। ওভাবে ছুটতে আমার খুব ভালো লাগত। চোখে মুখে যেমন ধূলো লাগত, তেমনি ফ্রক উড়ত চুল উড়ত—দারুন লাগত তখন।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পাতার ঘূর্ণি ওপরে উঠতে লাগল। গুম্ গুম্ করে উঠল মেঘ, ঝিলিক দিতে লাগল বিদ্যুৎ। তারপর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এলো।

আমি তখন খেয়াল করলাম যে আমি অনেক দূরে, জনমানবশূন্য একটা জায়গায় চলে এসেছি। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামতেই তাড়াতাড়ি একট পোড়ো বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগানটা আগাছায় ভর্তি, হাঁটা যায় না। হাওয়ায় ঝড়ে উঁচু উঁচু গাছগুলো দুলছে। বৃষ্টির ছাট বাঁকা হয়ে বিঁধছিল গায়ে। ভিজে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলাম। এদিকে রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। গাছের গা থেকে ঝোলানো গজপিপুলের লতাগুলো ভূতুড়ে দোলনার মতো দুলছে। আমি একটা বড় গাছের তলায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার ভীষণ ভয় করছিল।

ক্রমশ অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে আসতে আমি যে কি করব তা বুঝতে না পেরে যখন প্রায় কাঁদো কাঁদো তখনই হঠাৎ কড় কড় করে

বাজ পড়তে দেখি ঠিক আমারই সামনের গাছতলায় আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেও ভিজে কাক একেবারে। ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে। আমরা দুজন দুজনকে অন্ধকার আর মুষলধারে বৃষ্টির পর্দার জন্যে দেখতে পাই নি। ছুটে গিয়ে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। সে-ই রেবতী। সেই থেকে আমরা দুজন বন্ধু। রেবতীর দাদু খুব বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তুমি জানো কিনা জানি না রানী, তিনি বলতেন, তোদের নাম রেখেছি শ্রাবণ-সখী!

—বাঃ, কি সুন্দর নাম।

—হ্যাঁ, ভারী পোয়েটিক্।

রানী আর নলিনীপিসি চুপচাপ মুখোমুখি বসে ছিল। ভারী একটি শান্তির সময় নেমে এসেছিল দুজনের চারপাশে।

রাজেন্দ্রানী চলছিল।

ঠিক সেই সময় গোধূলী রক্তবর্ণ আকাশের পশ্চাদপটে উঠে দাড়াল সোমেশ্বরদার ছায়া। তিনি রানীকেই খুঁজছিলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, নমস্কার। নলিনীপিসি, আপনি বিকেলের চা খাবার খেয়েছেন?

—হ্যাঁ খেয়েছি। কেবল এককাপ চা। যা খেয়েছি দুপুরে। এত রকম খাওয়া তো অভ্যেস নেই। তাই বিকেলের খাবার আর খেতে পারলাম না।

নলিনীপিসি উঠে দাঁড়ালেন।

সোমেশ্বরদা বললেন, আপনি কি ভিতরে যাবেন?

—হ্যাঁ, শীত শীত করছে, একটা চাদরে আর হবে না। মোটা কার্ডিগান চড়াই·

নলিনীপিসি এগোতে লাগলেন। সোমেশ্বরদা রানীর কাছে সরে এসে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, রানীভাই, তোমায় যে তখন থেকে কত খুঁজছি! এ কেবিন, ও কেবিন। তুমি যে এভাবে ডেকের ওপর বসে আছ, তা আমি জানব কি করে?

রানী উঠে দাঁড়িয়ে স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, কেন সোমেশ্বরদা, কি হয়েছে?

- সব কথা কি সকলকে বলা যায় রানীভাই?

রানী নলিনীপিসির সঙ্গ নিতে যাচ্ছিল, সোমেশ্বর তার হাত ধরে টেনে ইশারা করে থেকে যেতে বললেন। নলিনীপিসি বাঁক ঘুরে নীচে চলে গেলেন। কেবল সোমেশ্বর আর রানী ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে সারা ডেকটা বদলে গেছে। আকাশ যে সব অসম্ভব রং মেখে ছিল, তা দ্রুত মুছে ফেলছে শরীর থেকে। জলের ওপর গাঢ় কুয়াশা নেমে আসছে।

সোমেশ্বরদার পরণে শাদা পায়জামা, কলিদার পাঞ্জাবী আর তার ওপর হাল্কা গেরুয়া রঙের রোমশ বালাপোষ। শান্ত হাসি হাসি মুখ সোমেশ্বরদার। কিন্তু রানী বুঝতে পারল তাঁর চোখ দুটি অস্থির চিন্তাগ্রস্ত। তাঁর লঞ্চের সংসারে কিছু একটা ঘটেছে তিনি খুব চাপা গলায় বললেন, রানী ভাই, তুমি কি আমার ছাড়া পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ঘুমের ওষুধের শিশিটা এনেছ?

—না-তো!

—সত্যি বলছ?

—আপনার ছাড়া পাঞ্জাবী কোথায় রাখা ছিল আমি তাই জানি না সোমেশ্বরদা!

—আমার পাঞ্জাবী, যেটা পরে আমি সাগর মেলায় ঘুরেছিলাম সেটা আমারই কেবিনে ছিল। সত্যি বলছ? তুমি নাও নি, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি?

সোমেশ্বরদা তাঁর উষ্ণ হাত দিয়ে রানীর দুটি হাত চেপে ধরলেন। রানী লক্ষ্য করল উত্তেজনায় তাঁর হাত দুটি অল্প অল্প কাঁপছে। কিন্তু রানীর খেয়াল হল এ হাত দুটি পুরুষের হাতও বটে। যে পুরুষ কেবল মিথ্যে কথা বলে, ভোলায় আর ঠকায়।

পরশু হলেও পারত না, কিন্তু এই দেড় দিনে সে প্রায় অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তাই অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে যেতে তার কিছুমাত্র আটকাল না। যদিও শিশিটা সে ফিরে নেয় নি। বুদ্ধিটা অবশ্য মাথায় খেললে পারত, সে কেবল 'নিই নি' না বলে বলল, কেন নেব সোমেশ্বরদা? ঘুমের বড়িতে আমার কি দরকার? আমার বয়স সবে একুশ। আমার জীবনে কোন অশান্তি নেই। আমি এই সবে জীবন আরম্ভ করতে চলেছি। আমার এখন কত আশা আকাঙ্খা।

—কিন্তু তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না রানী—যে আমার পকেটে ঘুমের বড়ির শিশিটা আছে।

রানী ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, বাঃ, আপনি মালতীবৌদির কথা দিব্যি ভুলে গেলেন। যিনি আপনাকে শিশিটা চুরি করে এনে দিলেন!

—মালতী। মুখের থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল সোমেশ্বরদার। মালতী। হ্যাঁ, মালতী জানে। কিন্তু সে নেবে না রানী। সে আমার স্ত্রী। সে আত্মহত্যা করার মেয়ে নয় রানী। সে অন্য বস্তু দিয়ে তৈরি। আর শিশিটা যদি সে নিতই তাহলে আগেই নিয়ে লুকিয়ে রাখত। আমার হাতে তুলে দিত না। না, না রানী, মালতী নয়, আর কেউ। নিলে আর কেউই নিয়েছে।

রানী হাসছিল। কিন্তু তার বুকের ভিতর একটা ঈর্ষার কাঁটা একটা যন্ত্রণাও বাজছিল। মালতীবৌদি বিষের শিশিটা নিয়েছে শুনে সোমেশ্বরদাকে এত আকুল, এত বিচলিত হতে দেখবে তা ভাবে নি রানী।

সোমেশ্বরদা তার হাসি লক্ষ্য করে বললেন, না না, তুমি জানো না রানী, মালতী ছাড়া আমি কিছু ভাবতেই পারি না। এই টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি—এই নানারকম কাজকর্ম, 'হবি' সব আমাদের দুজনের জিনিস। মালতীর মতো আমার এ সব কে বুঝবে?

কাউকে তো তেমন দেখলাম না। না না, মালতী আছে বলেই এই সব এত মনোরম, এত সুন্দর করে উপভোগ করতে পারছি। মালতী চলে গেলে, আমাদের দুজনের একজন চলে গেলে এ সবের মর্ম কে বুঝবে?

রানী তবুও হাসছিল। ক্রমশ তার হাসি বাঁকা হয়ে বিঁধছিল সোমেশ্বরদাকে।

—তুমি হাসছ রানীভাই! বিশ্বাস করছ না মালতী ছাড়া আমার চলে না?

—তাই যদি চলে না তবে সুখিয়া কেন?

সোমেশ্বরদা একটু টলে উঠলেন। রেলিঙ ধরে নিজেকে সামলালেন তিনি। রানীও সরে এলো তাঁর পাশে দোতলার ডেক থেকে নীচে, রাজেন্দ্রানীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা রাজেশদের লঞ্চটা দেখা যাচ্ছে। একটি কেবিনের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল হঠাৎ আলোটা নিভে গেল।

সোমেশ্বরদা বললেন, ওই কেবিনে এখন কে কে আছে জানো রানীভাই? মালতী আর নটরাজন।

রানী অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল।

—না না, আমি গোয়েন্দাগিরি করি নি। করি না। তোমাকে খুঁজছিলাম তো। তাই হঠাৎ চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা।

রানী বলল, কিন্তু সুখিয়া? আপনি খালি খালি সুখিয়ার কথা চেপে যাচ্ছেন!

—সুখিয়া? ও সব মালতীর তৈরি করা ব্যাপার! নিজের পাগলামি ঢাকবার জন্যে ওই সম্পর্কগুলো মালতী তৈরি করে। চারিদিকে বলে বলে বেড়ায়। সুখিয়া হল আমার বাগানবাড়ির জল-তোলা দাসী। মিসেস সাহানী মালতীর অসুখের সময় নার্স হয়ে এসেছিলেন। স্টেলা ডিকিনসন আমার দুই ছেলেকে পড়াত। মোহিনী কৃষ্ণম আমাদের হাউস-কীপার ছিল কিছু দিন। বেলারানী

ছিল আমার বাগানবাড়ির সরকারবাবুর তৃতীয় পক্ষ। ফুলমতিয়া, মহাদেবী আর তারামতী সব বেহারী আর নেপালী চাকর আর দরোয়ানদের বৌ।

রানী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সোমেশ্বরের দিকে। তাঁর দীর্ঘ অস্বাভাবিক সিল্যুয়েট্‌টার দিকে। তারপর চাপা গলায় বলল, আপনি এ সব বদনাম খামোখা খামোখা মেনে নেন?

—হ্যাঁ, আমার বদনামটা দিয়ে, ওর সুনামটা রাখি। তাছাড়া এটা তো কোন অন্যায় না। ইচ্ছাকৃতও না। এটা ওর রোগ। রোগের ওপর তো কারো হাত নেই রানীভাই। মালতী একধরণের পুরুষ দেখলে কিছুতেই আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। তাই ছেলেদেরও কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পাছে ওকে তারা না বুঝে অশ্রদ্ধা করে। নীচে স্বাগত লঞ্চের কেবিনের আলো জ্বলে উঠল। সোমেশ্বর চাপা গলায় রানীকে ডেকে বললেন, সরে এসো রানীভাই, ওরা এবার বেরোবে। এই লঞ্চে চলে আসবে। দৈবাৎ যদি একবার ওপরে তাকায় আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে।

রানী সরে এলো। তারপর বলল, আমি যাই সোমেশ্বরদা। একটু চা খাব এখন।

চা খেয়ে রানী চলে গেল রেবতীপিসির ঘরে। তার ধারণা ছিল নলিনীপিসি নিশ্চয়ই রেবতীপিসির ঘরে গল্প করছে। কিন্তু দরজা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল রেবতীপিসি কেবিনে একা। সন্ধ্যা পূজা সেরে তিনি পাশের বেড-সাইড টেবিলে রাখা ঠাকুরের ছবিটি গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছিলেন। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে। জানালা দিয়ে ঘোর ঠাণ্ডা আসছে লঞ্চের তলায় ঢেউয়ের তোলপাড় আন্দোলন।

রানী রেবতীপিসির পাশে বসে কলকাতা রেডিওর গান শুনছিল। কে যেন সুমিষ্ট স্বরে মীরার ভজন গাইছিল। একটু পরে নিউজ শুরু হল। কয়েকটা খবরের পর বলল,—বিখ্যাত শিক্ষাবিদ দার্শনিক সুপণ্ডিত ডক্টর সামসুল আলম আজ দুপুরে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে ক্যানসার

রোগে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ—

—যাক, মানুষটা বাঁচল এবার! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন রেবতীপিসি।

রানী বলল, ডক্টর সামসুল আলমকে তুমি চিনতে নাকি রেবতী-পিসি?

—না রে, আমি চিনব কি করে? তবে রোগটাকে তো চিনি। বড় যন্ত্রণাদায়ক রোগ। আমার মা তো ওই রোগেই মারা গিয়েছিলেন। দেড় বছর ধরে মাকে অসহ্য যন্ত্রণা পেতে দেখেছি।

কে এই বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্? সুপণ্ডিত সামসুল আলম। রানী কি কখনো তাঁর নাম শুনেছে? বড়জোর শোনা শোনা মনে হচ্ছে মাত্র। এর বেশি আর রানী কিছু মনে করতে পারল না।

রানীকে দেখে রেবতীপিসি যথাবিহিত নলিনীপিসির সংবাদ নিতে লাগলেন।

রানী বলল, আচ্ছা, নলিনীপিসিকে তোমার একদম ভালো লাগছে না রেবতীপিসি?

রেবতীপিসির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—তুই ঠিক ধরেছিস রানী! সত্যি রে, লীনা মানে নলিনীকে আমার একদম ভালো লাগছে না। ওকে সইতেই পারছি না। ও যেন কেমন আলাদা রকম হয়ে গেছে। সত্যি, আমরা দুজন যে কি বন্ধুই ছিলাম। ওর বাবা যখন ট্রান্সফার হয়ে গেলেন, তখন ওকে আমি ওর বাবার সঙ্গে যেতেই দিলাম না। কান্নাকাটি করে আমার সঙ্গে রেখে দিলাম। লম্বা একটি বছর আমরা এক ঘরে থেকেছি এক স্কুলে পড়েছি। তারপর আমার বাবাও বদলী হয়ে গেলেন। আমরা দুজনে ভর্তি হলাম কলকাতার স্কুলে। হস্টেলে থাকতাম আমরা। এক ঘরে বছরের পর বছর কাটিয়েছি। স্কুল লাইফে, কলেজ লাইফে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত একসঙ্গে।

রানী বলল, তারপর?

—তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছাড়াছাড়ি। নলিনীর বাবা ওকে একটা আরো দামী ইংলিশ-মিডিয়াম কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেখানকার কোর্স আলাদা। ও সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে বিদেশে চলে গেল। অনেক দূর পড়াশোনা করে ও ওখানেই রয়ে গেল। কিন্তু আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঠিকই ছিল। যেখানেই বদ্‌লি হয়ে যেতাম ওকে ঠিকানা পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ঠিকই ছিল। ফটো পাঠাত। মন খুলে সব কথা লিখত।—তারপর, তারপর কি যে হল?

আজ তো সারাদিন মেলায় ঘুরতে ঘুরতে বলেছিল—ও ড্রিঙ্ক করত। একদম ঠাকুর দেবতা মানে না। ও খুঁতখুঁতে। সব কিছুতেই সন্দেহ। আড়ষ্টভাব। অতিমাত্রায় ভদ্রতা। ওর সব কথাও ভালো লাগে না। যেন আমি ওর মতো লেখাপড়া জানি না বলে আমায় জ্ঞান দিতে চায়।

রানী হাসল।

—সত্যি, বন্ধুত্বের স্মৃতির সেই মধুর ছোঁয়াটুকু একদম উঠে যেতে না যেতে বরং ও চলে যাক। এই-ই আমি চাই।

রানী বলল, বেশ তো, তাই-ই হবে। উনি যাতে কলকাতায় ফিরে গিয়েই ভারত-দর্শনে বেরিয়ে পড়েন আমি সেই ব্যবস্থা করব। আজ রাত থেকে ওঁকে ভালো করে বোঝাব।

—খুব ভালো রানী, খুব ভালো হবে তাহলে। তুই তাই-ই বোঝা।

রানী নিজের কেবিনে শাড়ি বদলাতে গেল। নলিনীপিসি অন্ধকারে চুপচাপ স্থির হয়ে বসে ছিলেন।

রানী আলো জ্বালাতেই বললেন, রানী, তোমার জন্যে একটা শাড়ি আর চাদর রেখেছি, তুমি নাও। ওগুলো আমারই ছিল, আমি এখন আর পরি না।

রানী শাড়ি আর চাদর নিয়ে নলিনীপিসিকে কি যেন দিতে

যাচ্ছিল। তিনি আগেই বলে উঠলেন, না লক্ষ্মীটি, আপত্তি কোরো না, তুমি তো আমার মেয়ের মতো, কিছু মনে করলে আমি শুনবই না।

রানী হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে শাড়িটা আর স্কার্ফটা হাতে নিল। বিলিতি নাইলনের ফিকে সবুজ শাড়ি। আগাগোড়া বাদ্‌লার গুঁড়ো ছেটানো। শাড়িটা ঝিল্‌মিল্‌ করছে। চুলগুলি পরিস্কার করে আঁচড়ে লম্বা বিনুনি করল রানী। নলিনীপিসি বললেন, রানী, একটু সেণ্ট মাখো। তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।

রানী নলিনীপিসির বিউটি বক্স থেকে বিলিতি সেণ্ট বের করে সারা গায়ে স্প্রে করে নিল। বিছানার ওপর নূপুরদির দেওয়া টফির বাক্স। বাক্সটা থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে রানীর আবার দুঃখ হল। বাক্সে আর দুটি মাত্র নয়ন-সুকের রুমাল রয়েছে। একটি নিলে আর মাত্র একটি বাকী থাকবে। রুমালে সেণ্ট মাখিয়ে রানী পাট করে কোমরে গুঁজল।

নলিনীপিসি বললেন, বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!

রানী বলল, ঠাট্টা করছেন, নলিনীপিসি?

—না, ঠাট্টা করছি না। সত্যি, তুমি ছাখ।

সত্যি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ভালো লাগল রানীর। মনে হল ভালোই লাগছে।

কেবিন থেকে বেরোবার আগে রানী ওর সেই ছেঁড়া হাতব্যাগটা খুঁজতে লাগল। কোথাও দেখতে পেল না সেটা।

নলিনীপিসি বললেন, কি রানী, কি খুঁজছ?

—আমার হাতব্যাগটা নলিনীপিসি। একটু ছেঁড়া মতো।

নলিনীপিসি বললেন, সেটা তো মালতী নিল। সন্ধ্যের আগে আমার কেবিনে এসেছিল, সব ঠিক্‌ঠাক্‌ আছে কিনা দেখবার জন্যে। তোমার ব্যাগটা দেখে নিয়ে চলে গেছে। বলল, ইস্‌স্‌, এত ছিঁড়ে গেছে ব্যাগটা! ওকে আমি একটা নতুন ব্যাগ দেব। এটা

আমি নিয়ে যাচ্ছি। ব্যস্ত হয়ো না। যাও, বাইরে গিয়ে গল্প করগে।

রানী হেসে বাইরে চলে গেল। মুখে ঘামছিল বটে রানী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। মালতীবৌদিকে খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তার ওই ছেঁড়া ব্যাগে······

প্যাসেজেই রাজেশ আর নটরাজনের সঙ্গে দেখা হল রানীর। দুজনেরই হাতে বড় বড় বন্দুক। রানী ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকে চমকাতে দেখে, দুজনেই হেসে উঠল!

রানী বলল, বাব্বা, এত অস্ত্রশস্ত্র কেন?

নটরাজন বলল, আমরা ডাকাতি করব!

রানী রাজেশকে বলল, সত্যি বলুন না, এত বন্দুক-টন্দুক কেন?

—আমরা আজ রাতে নতুন দ্বীপে বুনো শূয়োর শিকার করতে নামব।

—সত্যি! আমাকেও নিয়ে যাবেন সঙ্গে বলুন।

—আপনি? আপনি কোথায় যাবেন? নটরাজন অবাক হয়ে বলল, নতুন দ্বীপে সিল্কের এই সব ফাইন শাড়ি-টাড়ি কিন্তু চলবে না একদম।

রাজেশ কোন কথা বলে নি। এতক্ষণ চুপচাপ রানীকে দেখছিল। এবার বলল, আপনাকে কিন্তু আজ চেনাই যাচ্ছে না এই শাড়িটা পরে!

রানী এবার খিল খিল করে হেসে উঠল। রাজেশবাবু, সকালের ত্রুটিটা সেরে নিচ্ছেন।

—আর ম্যানেজ দিতে হবে না। আমাকে যে কত আশ্চর্য সুন্দর দেখায় সে তো আমি আজ সকালেই আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সময়েই বুঝেছি। আমাকে তো—একটু শুদ্ধ ভাষায়ই বলি, দাসী ভেবেছিলেন আপনি, তাই না?

রাজেশ অপ্রস্তুত মুখে নিজের একটা হাত রানীর দিকে এগিয়ে দিল। যেন সন্ধির প্রস্তাব!

—বলুন, কি শাস্তি দেবেন? ; আমার হঠাৎ ভুল বোঝার জন্যে আপনার দেওয়া সব শাস্তিই আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।

নটরাজন বলল, আসলে, ও মানুষটাকে ভালো করে দেখে নি, পোশাকটাকেই শুধু দেখেছিল। আর ওই বিরাট জল ভরা বালতিটাকে।

রানী বলল, নটরাজন, অন্তত আপনি তো জানেন আমি যে সমাজের মানুষ, সে সমাজে মেয়েদেব রূপের প্রশংসা খুব একটা অবশ্য কর্তব্য নয়।

রানী, রাজেশ আর নটরাজনের পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে ঈষৎ মাদকের গন্ধ পেল।

মালতীবৌদিকে এখন তার খুঁজে বের করতেই হবে। সেটাই তার পক্ষে খুব জরুরী। যাবার আগে বলে গেল, জেনে রাখুন, আজ রাত্রে আপনাদের সঙ্গে আমি নতুন দ্বীপে যাচ্ছি। আমাকে কেউ লক্ষে রাখতেই পারবে না।

রানী গিয়ে মালতীবৌদির কেবিনের দবজায় টোকা দিল।

ভিতর থেকে পিঙ্কিব গলা শোনা গেল, কাম ইন প্লিজ।

রানী দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকতেই তার মনে পড়ল, মালতী-বৌদি আর পিঙ্কি কেবিন বদল করেছে। বিছানায় পিঙ্কি একা শুয়ে ছিল। তার মুখে শাদা ফ্যাকাশে হাসি।

রানীর দিকে তাকিয়ে পিঙ্কি বলল, এসো, আমার কাছে এসো।

—না, না, তুমি বিশ্রাম কর পিঙ্কি, আমি যাই।

—আহাঃ, এসো না, বসো, আবার তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে। হয়তো কোন দিনই আর দেখা হবে না!

রানী মাথা নাড়ল। সত্যিই তো, সে আর পিঙ্কি তারা দুজনে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জগতের মানুষ। একই কলকাতা শহরে থাকে দুজন। বছরের পর বছর কেটে গেলেও কিন্তু দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

রানীর ঈষৎ রুক্ষ হাতটা নিজের নরম ঠাণ্ডা দুটি হাতের মধ্যে চেপে ধরে পিঙ্কি বলল, একটু বসো না আমার কাছে। একটু থাকো না। রানী পিঙ্কির কাছে এসে বসতেই পিঙ্কি বলল, রানী, তুমি বরং ওই দেয়ালগিরিটা নিভিয়ে দিয়ে, কেবল বেড ল্যাম্পের নীল আলোটা জ্বেলে দাও।

রানী উঠে দেয়ালগিরিটা নিভিয়ে দিয়ে বেড ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। তারপর পিঙ্কির মাথার কাছে বসে তার এলো করা রেশম-নরম চুলের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে লাগল।

পিঙ্কি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রানী, আমি তোমার চিঠি দুটো পড়েছি।

—আমার চিঠি দুটো? মানে আমার সেই ছেঁড়া ব্যাগে যে চিঠি দুটো ছিল!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি তো ভালো বাংলা পড়তে পারি না। একজন আমাকে তাই পড়ে শোনাল।

রানী চমকে উঠে বলল, সে কী! আরো কেউ পড়েছে চিঠি দুটো?

—হ্যাঁ পড়েছে। অন্যায় হয়ে গেছে রানী। স্বীকার করছি। তুমি আমাকে, আমাদের যা ইচ্ছে শাস্তি দাও। কিন্তু রানী, তুমি যা লিখেছ, তার প্রতিটা কথাই এত সত্যি! সত্যি, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যেও একটা পয়েন্ট চাই।—টু বি, অর নট টু-বি—এমনি টালমাটাল বেঁচে না থেকে একেবারে মৃত্যুর দিকে হেড লঙ যাওয়া উচিত। সোজা। সিধে।—টু ডাই—টু স্লীপ·····

রানী চমকে উঠে বলল, তুমি কী বললে?

ক্লান্ত গলায় পিঙ্কি মিন্‌মিন্ করে বলল, হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত সলিলকীটা বলছি। টু ডাই টু স্লীপ,—হ্যাঁ না, তার চেয়ে মরা ভালো, না ঘুমিয়ে পড়া ভালো।

রানী বলল, আমি কিন্তু হ্যামলেটের নামই শুনেছি, হ্যামলেট পড়ি নি পিঙ্কি!

—আমি পাগলের মতো পড়ি। কারণ পড়া ছাড়া আর কিছুতেই

তেমন বিশেষ ইন্টারেস্ট পাই না রানী। আর শেক্সপীয়র,—কেন জানি না এত সব পড়ার পরও দেখলাম ওই লোকটাই জীবনের সমস্ত মোদ্দা কথাটাই বলে গেছে!

—টু ডাই! টু স্লীপ!—তার চেয়ে মরা ভালো, না ঘুমিয়ে পড়া ভালো, বাঃ, ভারী অদ্ভুত তো? কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগছে পিঙ্কি!

—আশ্চর্য লাগছে? কেন?

—তুমি কেন এ সব কথা নিয়ে ভাববে? তোমার সামনে এখন সারাটা জীবন পড়ে আছে।

—সত্যিই তো। আমি যে পিঙ্কি। আমি যে রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি। টাকা পয়সা আরাম সুখ অঢেল লাক্সারির মধ্যে মানুষ হয়েছি। তাই না রানী?

সাদা বালিশের ওপর পিঙ্কির ব্রোঞ্জ রঙের রিঙের মতো পাকানো পাকানো চুল ছড়িয়ে আছে। তার ফরসা কপাল, টিকৃটিকে নাক, টানা টানা বড় বড় চোখ। চোখ খুললে মনে হয় দুটি আকাশমুখী বন্ধ জানালা খুলে গেল। পিঙ্কির পরণে ছোট ছোট রূপোলী তার দেওয়া পুরু শাদা সিল্কের রাত-পোশাক। গায়ে কোন অলংকার নেই। দেবদূতীর মতো দেখাচ্ছিল পিঙ্কিকে ক্রিসমাসেব গল্পে যাদের ছবি থাকে।

রানী বলল, তা নয় পিঙ্কি, তবে তুমি দুঃখেব কথা ভাববার, গভীর কথা ভাববার ফুরসৎ পাও কখন, কি করে? সেই কথাটাই আমি কেবল ভাবছি।

—পাই। কারণ মিশতে হলে এত বেশি মিশতে হয়, এত সোরগোল, হট্টমালা, এত হুল্লোড় যে আমি বলতে গেলে বিশেষ কারো সঙ্গে মিশিই না। আমি তো এম. এ পাশ করার পর আমাদের ভিলায় চলে গিয়েছিলাম। চন্দননগরে খুব শান্ত পরিবেশে অনেক জায়গা নিয়ে আমাদের ভিলা। কিন্তু ফিরে এলাম কলকাতায় রিসার্চ করবার জন্যে। আমাদের দুটো ফ্ল্যাট রাখা আছে পার্ক স্ট্রীটের

'কুবলয় মাল্‌টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এ। বাবা মাকে ওখানেই থাকতে হয়। বাবার কাজকর্ম তো সবই কলকাতায়।

—তুমি এম. এ পাশ করে গেছ? বাব্বা!

—কেন? আমার এখন বাইশ বছর বয়স না? তুমিও তো পড়লে এতদিনে পাশ করে যেতে, যেতে না?

রানী বলল, যাক্‌গে ও সব কথা। অনেকক্ষণ ধরে তোমায় কথা বলাচ্ছি, সোমেশ্বরদা মালতীবৌদি এবার ঠিক বকুনি দেবেন আমাকে। আমি বরং যাই। পিঙ্কি, আমার চঠি দুটো আমাকে ফিরিয়ে দাও না।

—তোমার চিঠি দুটো ওই যে নতুন ব্যাগে রেখেছেন মালতী-বৌদি। শুধু চটি নয়, যাবতীয় জিনিস তোমার পুরোনো ছেঁড়া ব্যাগে যা ছিল—সব।

রানী তাকিয়ে দেখল কাবার্ডের ওপর ভারী সুন্দর গড়নের একটি লেদারের ব্যাগ রয়েছে।

রানী বলল, সত্যি, মালতীবৌদির সব দিকেই দৃষ্টি।

রানীর কথা শেষ হতে না হতেই স্লাইডিং ডোর খুলে ভিতরে ঢুকলেন সুহাসদা।

—রানী, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

—কেন সুহাসদা?

—তুমি নাকি রাজেশকে বলেছ, আজ রাতে নতুন দ্বীপে যাবে?

সুহাসদার ঈষৎ রাঙা চোখের দিকে তাকিয়ে রানী ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, হ্যাঁ, যাব বলেছি। তাতে হয়েছেটা কী? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কী দোষ করেছি? জীবনের সব থ্রিল, সব এ্যাডভেঞ্চার কেবল আপনারাই 'এনজয়' করবেন।

—না না, তুমি নতুন দ্বীপে নামবে না।

—কেন, আপনার তাতে কী?

—তুমি আমাদের সঙ্গে এসেছ। আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। সুহাসদা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন।

এবার রানীর কণ্ঠস্বর রিন্‌রিন্‌ করে বেজে উঠল। সে বলল, না, আপনার কোন দায়-দায়িত্ব আমি স্বীকার করি না সুহাসদা।

—স্বীকার কর না?

—না, স্বীকার করি না। এখন আপনি কি আমায় তাড়িয়ে দেবেন? সুহাসদা, আপনি আমায় তাড়িয়ে দিতেও পারবেন না। কারণ এখন আমি আলাদা। আমি একা। কারো সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। কোন আত্মীয়তা নেই। বিশেষ করে আপনার সঙ্গে তো নয়ই। এটা কলকাতা শহরও না। কিংবা আপনার বাড়িও না, যে আমাকে গলাধাক্কা দেবেন। এটা সমুদ্র। ইচ্ছে হলেই আপনি আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছে হলে আমি, এই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে পারি। সুহাসদা, খুব বড় জায়গায় কোন ছোট সম্পর্ক মানায় না।

—কি বলছ তুমি রানা! উদ্ধত সুহাসদা যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলেন।

রানী বলল, তাছাড়া যে মুহূর্তে নূপুরদিকে আপনি আমার দুর্বলতার কথা জানিয়ে দিয়ে, হাত ধুয়ে ফেলে 'সতী' সেজেছেন। সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার কেউ না।

—বেশ, কেউ কিনা দেখা যাবে। ক্রুদ্ধ আক্রোশে সুহাসদা কেবিনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। রানী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজাটা আবার ঠেলে বন্ধ করে দিল। ক্রোধে রানীও ফুঁসছিল।

পিঙ্কি বলল, বেচারী ভদ্রলোক! একটু নেশা-টেশা করেছিলেন, তুমি রাগিয়ে দিয়ে সব নেশা ছুটিয়ে দিলে।

রানী হাসতে হাসতে ফিরে এলো পিঙ্কির কাছে।

—আচ্ছা পিঙ্কি, আমি তো কোন কুপিত গ্রহকে শান্ত করার জন্যে কোন কিছু ধারণ করি নি, তবে আজ এত ঘন ঘন আমার জন্মদিন হচ্ছে কেন? সকলের এত আগ্রহ কেন আমার ওপর?

এত শাড়ি, জামা, স্কার্ফ, ব্যাগ—সুহাসদার মতো ভালো ভালো আদুরে কথাবার্তা! কী ব্যাপার বল তো?

পিঙ্কি বলল, সব মানুষের আঙুলেই একটা পাথর থাকে। যাকে বলে 'আনফোরসিন', আমি তো বাংলা জানি না ভালো, কথাটার বাংলা করে বলতে পারলাম না!

রানী বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ঠিকই বলেছ।

—আর তা ছাড়া রানী আজ তো সত্যিই তোমার জন্মদিন, তাই না?

—কেন?

—কাল তো তুমি মরেই গেছ। আজকের এই বেঁচে থাকাটা তো তোমার কাছে পুনর্জন্ম, তাই না?

—কক্ষনো না!

—পিছনের কুড়ি একুশটা বছর ভুলে যেতে পারো না তুমি। এটা সমুদ্র, তুমি সম্পর্কহীন, এখান থেকে আবার নতুন করে জন্ম নিতে পারো না তুমি?

রানী বলল, পারলে হয়তো খুব ভালো হত। কিন্তু জানো পিঙ্কি, সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি অন্য ভাবে ভেবেছি। আমি মৃত্যুর কথা ভেবেছি। ওই যে তুমি বলছিলে, --টু ডাই, টু স্লীপ···

পিঙ্কি হাসল।—রানী, তুমি কি বুঝতে পারো না, মৃত্যু তোমার জন্যে নয়। তুমি বেচে থাকার জন্যে···পিঙ্কির কথা শেষ হবার আগেই স্লাইডিং ডোর ঠেলে মালতাবৌদি ভিতরে এলেন।

—বাঃ, রানী তোমাকে তো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!

পিঙ্কি বলল, ও বিশ্বাস করবে না বলে বলি নি, বল বৌদি, ওকে কি ভালো লাগছে না?

—সত্যিই ভালো লাগছে। তারপরই প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মালতীবৌদি চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বললেন, কিন্তু তুই কেমন আছিস পিঙ্কি? তোকে নিয়েই আমার ভয়!

—না বৌদি, 'এ্যাস্পরিন' আর 'এভোমিন' খেয়ে ভালোই আছি এখন। তুমি ভেবো না।

—ভাবব না আবার। তোর সিরিয়াস কিছু অসুখ-টসুখ করলে তোর মা-বাবাকে আর মুখ দেখাতে পারব আমরা!

—আমার মুখ আমি দেখাব, তুমি অত ভাবছ কেন?

—রাজেশ কোথায় রে?

—ও বন্দুক-টন্দুক সাফ করছে বোধ হয়।

—তোর কাছে ওর একটু বসা উচিত ছিল,

—না রে বাবা না। ও ইচ্ছে করে যায় নি, আমিই ওকে পারমিশন দিয়েছি। ও তো কুমায়ুনের জঙ্গলে অনেক শিকার খেলেছে, এখানেও একটু এক্সপিরিয়েন্স করুক না।

—বাব্বা, কত ভাব!

পিঙ্কি রানীর মতো হাসল!

—একদিনেই এত!

রানী মুগ্ধ হয়ে মালতীবৌদিকে দেখছিল। এ আবার মালতী-বৌদির আর এক রূপ। তাঁর পরণে কালোর ওপর চওড়া চওড়া সবুজ ডোরাকাটা তাঁতের শাড়ি। হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে মেশানো সবুজ রেশমি চুড়ি। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। সত্যজিৎ রায়ের ছবির দেবী দেবী চেহারার নায়িকাদের কথা মনে হয়। তবে ঈষৎ স্থূল। তিনি বললেন, রাতে তুই কি খাবি বল?

—কিছু খাব না বৌদি!

—অন্তত একগ্লাশ দুধ খা।

—বেশ, পাঠিয়ে দিও।

—ভালোই হল। নলিনীপিসি, রেবতীপিসি, অজিতপিসেমশাই ও বিশেষ কিছু খাবেন না বলছিলেন। ছেলেরাও ড্রিঙ্কসের সঙ্গে প্রচুর ফিসফিঙ্গার আর ফ্রাই খেয়েছে। ওরাও আর খাবে না। সারা ডাইনিং টেবিল জুড়ে ওরা অস্ত্রশস্ত্র সাফ করছে। এক কাজ করা

যাক, রাতের খাওয়া ডাইনিং রুমে না দিয়ে ঘরে ঘরে দিয়ে দিই। আমরা প্রায় নতুন দ্বীপে পৌঁছেই গেছি। ওখানকার সমুদ্রে। অবশ্য আজ রাতেই নামব না। সমুদ্রের মধ্যেই রাত কাটাব। কেবল ছেলেরা চলে যাবে স্পীড বোটে।

টক্ টক্ করে কেবিনের দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

মালতীবৌদি বললেন, কে চূড়ামণি? এসো, ভিতরে এসো!

সত্যিই চূড়ামণি। মালতীবৌদি চূড়ামণির টোকাটাও চেনেন। আশ্চর্য!

চূড়ামণি বিনীত স্বরে বলল, বড়মা, আলি বলছিল, ওর লঞ্চটার মেশিনটা গড়বড় করছে। ও নামখানা থেকে মিষ্টি জল নিয়ে যে ভোরের আগেই ফিরতে পারবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

মালতীবৌদি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সে কী! তাহলে কি হবে?

চূড়ামণি বিনীত ভঙ্গীতে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আলি বলছিল, যদি ওর লঞ্চটা রেখে দিয়ে 'স্বাগত' লঞ্চটা নিয়ে নামখানায় যায়, তাহলে কিন্তু কাল সকালের আগেই নতুন দ্বীপে ফিরে আসতে পারে।

—বেশ তো তাই-ই কর। তা ছাড়া তো উপায়ও নেই। ইঞ্জীনিয়র আর আর্কিটেক্ট বাবুরা তো আজ রাতে দ্বীপে নামবেন। সুতরাং শোয়ার ঝামেলা নেই। ওঁদের একবার জিজ্ঞেস করে নিয়ে আলিকে আর ওই লঞ্চের মানুষদের খাইয়ে-দাইয়ে লঞ্চটা রওনা করিয়ে দাও। ও হ্যাঁ, সব ঘরেই স্যাণ্ডুইচ ফল দুধ পাঠিয়ে দেবে, কেবল জার্নালিস্ট দুজনকে ফুলকোস ডিনার দেবে। ওঁরা বলছিলেন ওরা রাতে দ্বীপে নামবেন না।

চূড়ামণি মাথা হেলিয়ে চলে গেল।

পিঙ্কি বলল, মা যদি চূড়ামণিকে পায় তো স্মাগ্ল করে নিয়ে যায় প্রায়।

—তোর মা বলছিল বুঝি?

—প্রায়ই বলে।

মালতীবৌদি খুব একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, যাকগে, আর আড্ডা নয়। রানী চল, আমরা বাইরে যাই। আর পিঙ্কি, তোকে একগ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে সোজা ঘুমোবি। কোথাও বেরোবি না। ঘুরবি না, উঠবি না। ভালো করে রেস্ট নিলে তবে তোকে কাল নতুন দ্বীপে নামার পার্মিশন দেব।

পিঙ্কি বলল, নতুন দ্বীপ খুব সুন্দর বুঝি?

—স্বপ্নের মতো, তুই ভাবতেও পারবি না!

পিঙ্কির চোখ দুটিও অর্ধনিমীলিত, স্বপ্নময় হয়ে উঠল। সে বলল, তাহলে আমার দরজার ওপর একটা 'ডু নট ডিসটার্ব' কার্ড লটকে দিয়ে যাও,—

—দেবই তো। তা না হলে রাজেশ তো তোকে বার বার ডিসটার্ব করতে আসবে। দাঁড়া—বলে বাইরে বেরিয়ে এসে রানীকে চাপা গলায় মালতীবৌদি বললেন, দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। সত্যি, আমি কিন্তু এতটা আশা করি নি।

—কাদের মালতীবৌদি?

—রাজেশ আর পিঙ্কির।

মালতী বৌদি আপন মনেই বললেন, সত্যি, আমি কিন্তু এতটা আশা করি নি। বলে মালতীবৌদি কিচেনের দিকে নেমে গেলেন।

রানী সারা লঞ্চে একবার চক্কর দিয়ে এলো। কি সর্বনাশ, কোমরে গুঁজে রাখা তার তৃতীয় রুমালটাও হারিয়ে গেছে। ইসস্ আর মাত্র একটা রুমাল রইল সেই সুখস্মৃতির টফির বাক্সে!

ডাইনিং কেবিনে শিকারীরা সাজসজ্জা করছে। সোমেশ্বরদা, নটরাজন, সঞ্জয় বসু। আর জার্নালিস্ট দুজন—দেবেন মুখার্জি আর চন্দ্রচূড় সান্যাল—তাঁদের সঙ্গে শুধু মদ্যপানে অংশগ্রহণ করছেন।

রানী মনে মনে ঠিক করে রাখল যে সে আগে থাকতে স্পীড

বো:ট চড়ে বসে থাকবে। ডাইনিং কেবিন ছেড়ে লঞ্চের অন্য প্রান্তের ডেকে গিয়ে দাঁড়াল সে।

দেখল অন্ধকার ডেকের শেষতম প্রান্তে একেবারে রেলিঙের ধারে সুহাসদা আর নূপুরদি পাশাপাশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে দুটো অধিকতর কালো ছায়া।

ওই শক্ত আড়ষ্ট দুটি ছায়ামানুষকে অন্ধকারে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কারণ সুহাসদার পরণে আঁটো সাঁটো শিকারীর পোশাক। আর নূপুরদির পরণে কালো কার্ডিগান, আর কালো বেলবটম্।

নিজের কেবিনে ফিরে আসতে আসতে রানী দেখল পিঙ্কির কেবিনে ট্রেতে করে দুধ নিয়ে যাচ্ছে চূড়ামণি। নিজের কেবিনের স্লাইডিং ডোরটা খুলে দেখল দুধের জগ আর স্যাণ্ডুইচের প্লেট নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন নলিনীপিসি।

এক কাপ দুধ আর দুটো স্যাণ্ডুইচ বড় তোয়ালের ওপরে রেখে রানী বিছানাতেই আরাম করে বসল।

নলিনীপিসি বললেন, আজকের দিনটা ভারী সুন্দর কাটল, না রানী? অনেক দিন মনে থাকবে।

রানী বলল, সত্যিই আজকের দিনটা বড় অদ্ভুত।

খেয়ে-দেয়ে নলিনীপিসি গরম কট্সউলের রাত-পোশাক পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে যখন শুলেন রানী তাঁর গায়ে দু'প্রস্থ লেপ দিয়ে দিল। নলিনীপিসি বললেন, রানী, আমাদের লঞ্চটা দাঁড়িয়ে গেছে মনে হচ্ছে, না?

রানী বলল, হ্যাঁ, আমরা বোধ হয় নতুন দ্বীপে পৌঁছে গেছি নলিনীপিসি।

জোরালো দেয়ালগিরি নিভিয়ে দিয়ে রানী ওর নিজের দিকের মৃদু রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালল। নলিনীপিসি অস্পষ্ট গলায় বললেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ছ নাকি রানী?

রানী বলল, না, আমি একটু বাইরে যাব। আড্ডা দেব।

—যাও।

রানী স্যুটকেশ খুলে একটা মোটা সুতোর তাঁতের শাড়ি বের করে পরে নিল। সঙ্গে নূপুরদির আগের দান করা ফুলহাতা কালো ফ্লানেলের ব্লাউজ। তার ওপর তার নিজের একটা বেরঙা কট্‌স্‌উলের র‍্যাপাব ঘোমটা দিয়ে জড়িয়ে নিল। তারপর কোথায় স্পীডবোটগুলো আছে দেখবার জন্যে টিপি টিপি সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে গেল। দুটো স্পীডবোট পাশাপাশি বাঁধা আছে। কিন্তু তার মধ্যে বসলে বোটের অন্য অন্য যাত্রীদেব কাছ থেকে নিজেকে লুকোনো যাবে না।

সুতরাং ওপরে উঠল রানী। রাজেশকে খুঁজতে লাগল সে। ডাইনিং রুমে রাজেশ নেই। তাহলে কোথায় গেল? পিঙ্কির ঘরে? রানী পিঙ্কির ঘরের দিকে ছুটল। নাঃ, সেখানে দরজায় একজন বেয়ারা বসে আছে। সত্যি সত্যি একটা আইভরি ফিনিশ কার্ডে সোনালী বর্ডারের মাঝ-খানে লেখা 'প্লীজ ডু-নট ডিসটাব', দরজায় লট্‌কানো আছে।

রানী ফিরল। সে নেমে 'স্বাগত'য় গেল। 'স্বাগত' ছোট নিরাড়ম্বর লঞ্চ। রানী চলল রাজেশের কামবায়। রাজেশ তার জিনিসপত্র গুছোচ্ছিল। হাঁটু পর্যন্ত রবারের গামবুট। বড় কিট্‌ব্যাগে প্রচুর সরঞ্জাম। মায় একটা ওয়াটারপ্রুফ পর্যন্ত। রানী বলল, বাব্বা, এত সব নিয়ে শিকারে যেতে হয় বুঝি?

রাজেশ বলল, তা-ও এখনো বন্দুকটা বাকি আছে। বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

রানী একটা চেয়ারে বসল।

রাজেশ বলল, একটু পরেই অবশ্য আমরা লঞ্চ খালি করে চলে যাব। এই লঞ্চ নামখানায় চলে যাবে জল আনতে।

রানী বলল, একটা রিকোয়েস্ট করতে এসেছি আপনার কাছে।

—বলুন না!

—আমি কখনো শিকার দেখি নি। আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন, প্লীজ…

রাজেশ বলল, আপনি এত কষ্ট করতে পারবেন না, সত্যি! কখনো যান নি তো শিকারে, কোন ধারণাই নেই আপনার।

—যত কষ্টই হোক, আমার এই কথাটা রাখুন, লক্ষ্মীটি!

রাজেশ অপ্রস্তুত হাসল—আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না। যদি সোমেশ্বরদা কিছু মনে-টনে করেন।

—আমি লুকিয়ে থাকব। দ্বীপে গিয়ে তারপর বলব আমি একা একা লুকিয়ে এসেছি। কারো দোষ নেই। সত্যি আপনাদের নামও করব না।

রাজেশ তবু কিন্তু কিন্তু করতে লাগল। হঠাৎ রানী শুনল নটরাজনের সুরেলা কণ্ঠ, কি হয়েছে, চলুন না। যখন মজাটা বুঝবেন তখন আমরাও মজা দেখব।

রানী ফিরে দেখল নটরাজন খুব হাসছে।

—আরে ইয়ার—বাচ্চা মেয়ে, এ্যাডভেঞ্চার করতে চাইছে, কেন বাধা দিচ্ছ!

রানী বলল, তাহলে আমার আপীল মঞ্জুর তো?

রাজেশ বলল, জরুর! যখন নটরাজন গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে তখন আর আমার বলার কী আছে।

রানী বলল, আমি তাহলে এখন যাই। আপনারা তিনজন একটা আল দা স্পীডবোটে উঠবেন তাহলে সেটাতেই আমি যাব। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, পিঙ্কি যদি ভালো থাকত পিঙ্কিকেও নিয়ে যেতাম।

নটরাজন বলল. খুব বুদ্ধি আছে তো আপনার। মানে দুষ্টু বুদ্ধি!

রাজেশ বলল, না না, পিঙ্কি যাবে না। ওর শরীর খুব খারাপ। সঞ্জুকে বলব সোমেশ্বরদার স্পীডবোটে যেতে। আর তো শুনছি সুহাসদা নূপুরাদ যাবেন।

রানী বলল, বেশ আমি তাহলে এখন অফিসিয়ালি শুতে যাই!

নটরাজন চেঁচিয়ে বলল, শুনুন, সঙ্গে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে, তোয়ালেয় মুড়ে একটা চেঞ্জ নেবেন।

রানী বলল, আচ্ছা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে রানী দ্রুত নিজের কেবিনে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল সে উৎকর্ণ হয়ে। তার বুক উত্তেজনায় দুরু দুরু কাঁপছে। একটু পরেই 'স্বাগত' লঞ্চটা নামখানার দিকে ছেড়ে গেল। রানীর হাত লাগল সেই সুখস্মৃতি আঁকা টফির বাক্সটায়। যার মধ্যে তার শেষ রুমালটা রয়েছে। রুমালটা কি মনে করে সে ব্লাউজের মধ্যে ভরে নিল। এবার তার স্থির বিশ্বাস, সে রুমালটা হারাবে না। নলিনীপিসিব গভীর নিশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। লঞ্চের দেওয়ালে জলের ঢেউয়ের মৃদু ছপ্ ছপ্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এখন অন্ধকার। সব লেপাপোঁছা। কাল সকালবেলা দেখা যাবে নীল সমুদ্রের ওপর রাজেন্দ্রানী দাঁড়িয়ে আছে। তখন কত রঙ।

টুক্ টুক্ করে দরজায় টোকা পড়ল। রানী আস্তে আস্তে স্লাইডিং ডোরটা খুলে বেরুল। বাইরে রাজেশ আর নটরাজন দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় রাজেশ বলল, ওরা স্পীডবোটে উঠে গেছে। একটায় সুহাসদা আব নূপুরদি' আর একটায় সোমেশ্বরদা আর সঞ্জয়! ওদেরটা ছেড়ে গেলে, মালতীবৌদি ঘরে চলে গেলে, আমাদেরটা ছাড়ব। মালতীবৌদি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। নটরাজন খাবার বাহানা করে টাইম নিচ্ছে।

রানী বলল, আমি এখন কি করব তাহলে?

—নীচে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকুন। কেউ যেন দেখতে না পায়।

নটরাজন বলল, চেঞ্জ নিয়েছেন তো?

রানী বলল. এই নিচ্ছি।

—আঃ, দারুণ!

কথাটা মনে মনে বলল রানী। তার এত মৌখিক উচ্ছলতা মানায় না। তাব একপাশে নটরাজন, আর একপাশে রাজেশ।

তিনজনে ঠাসাঠাসি করে বসেছে। স্পীডবোটটা তীরবেগে ছুটে চলেছে নতুন দ্বীপের দিকে। আকাশে অল্প অল্প অল্প মেঘে তারা ঢেকে যাচ্ছে। হাড় কাঁপানো শীতে জমে যাচ্ছে শরীর। রানীর পায়ে শুধু একজোড়া প্লাষ্টিকের চটি। স্পীডবোটটা মাথা উঁচু করে জলের সমতলে পিছনটা রেখে প্রায় দ্রুতই যাচ্ছে। দারুন শব্দ। পাইলট সজোরে চালাচ্ছে।

রাজেশ আঙুল উঁচিয়ে বলল, ওই তো নতুন দ্বীপ!

রানী ঠাহর করে দেখল দূরে একটি দুটি লাল্‌চে আলোর বিন্দু।

নটরাজন বলল, ওদের স্পীডবোটগুলো কোথায়?

রাজেশ বলল, এতক্ষণে পৌঁছে গেছে দ্বীপে।

—দারুণ, দারুণ···আবার রানী বলল মনে মনে। মাথা কান ঢাকা দিয়ে সে ঘোমটা দিয়েছে। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাদর-টাদর সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। তার মুখে সমুদ্রের সূক্ষ্ম ছিটে স্প্রের মতো এসে লাগছে।

স্পীডবোট এত দ্রুত যাচ্ছে যে নতুন দ্বীপ চোখের সামনে নিমেষে নিমেষে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। খুব কাছাকাছি লাল লাল আলোর বিন্দু। সব লণ্ঠনের আলো। সাগরের উথাল-পাতাল ঢেউ এবার টের পাওয়া যাচ্ছে। তীর এগিয়ে এলেই ঢেউয়ের প্রকোপ বাড়ে। পাইলট এবার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এবার একটু ধরে-টরে বসুন স্যার!

বলতে না বলতেই বুলেটের মতো স্পীডবোটটা নতুন দ্বীপে বিঁধে ঘুরে গেল। রাজেশ আর নটরাজন ভয়ে থর থর্ করে কাঁপতে থাকা রানীকে না ধরলে, রানী কোথায় ছিটকে চলে যেত।

নটরাজন বলল, কি, মজাটা কেমন লাগছে বলুন এবার!

রানী কাঁপা গলায় বলল, কেন, ভালোই তো।

রাজেশ বলল, চলুন, নামুন তো।

রানী বলল, এই জলের মধ্যে?

—হ্যাঁ। এখানেই তো নামতে হবে।

ফণা তোলা অস্থির সব ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে নামতে গিয়ে, ওই অত ঠাণ্ডার মধ্যে রানীর প্রায় কোমর পর্যন্ত ভিজে গেল। রানী শিউরে উঠে পায়ের তলায় দেখল চটি নেই। ধুয়ে চলে গেছে। জলের ঢেউ ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টানে সরে যাচ্ছে বালি। পড়তে পড়তে রাজেশ আর নটরাজনকে ধরে সামলে উঠে দাঁড়াতেই দেখল কোমর পর্যন্ত জল কোথায় চলে গেছে। পায়ের তলায় কেবল ভিজে বালি।

ছুটে বীচের ওপর দিকে চলে যেতে যেতে নটরাজন বলল, কি, কেমন মজা বুঝছেন এখন?

শীতে কাঁপতে কাঁপতে রানী তবুও বলল, দারুণ ভালো লাগছে।

বীচের ওপর আরো দুটি স্পীডবোট দাঁড়িয়ে। সবাই উঁচু শুকনো বালির ওপর উঠে গেছেন। হ্যাজাক জ্বালা হচ্ছে। টর্চের আলো ঘোরাঘুরি করছে চারিদিকে। লণ্ঠন নিয়ে নেমে আসছে কিছু দ্বীপের মানুষ

রানীরা এগিয়ে গেল। একটি হ্যাজাক তখন জ্বলে উঠেছে। পাইলট তিনজন বীচে ত্রিপল আর কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। সোমেশ্বরদা, সঞ্জয় বসু, সুহাসদা আর নূপুরদি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সোমেশ্বরদা রানীকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, ও কী রানী। তুমি!

রানী কাতর স্বরে বলল, সোমেশ্বরদা। প্লীজ, বকবেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে না এলে আপনি আসতে দিতেন না।

সুহাসদা দু'পকেটে হাত ভরে রাগী সুরে বললেন, রানী, তুমি আমার কথা শুনলে না?

নূপুরদি সহৃদয় কণ্ঠে বলল, আহা, বেচারীকে বকছ কেন? এসেই যখন পড়েছে—

রাজেশ বলল, শুধু এসে পড়েছেন নাকি, দেখুন না, একেবারে কাকভেজা অবস্থা—

সোমেশ্বরদা বললেন, কি সর্বনাশ, এই শীতে…

নূপুরদি বললেন, আয় আয়, চল, ওই অন্ধকারের দিকে গিয়ে ভিজে শাড়ি পালটে নিবি…আমার সঙ্গে শাড়ি-টাড়ি আছে।

রানী তাড়াতাড়ি নূপুরদির পাশে গিয়ে বলল, নূপুরদি, বড় শীত করছে গো—দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে লণ্ঠন আর হ্যারিকেন হাতে দ্বীপের লোকেরাও নেমে এসেছিল। ঘিরে দাঁড়িয়েছিল চারিদিকে। একজন এগিয়ে এসে সোমেশ্বরদাকে নমস্কার করে বলল, সায়েব, আমি পীতাম্বর।

—আরে, আরে, এই তো পীতাম্বর এসে গেছে। পীতাম্বর তোমাদের মাছ খুব ভালো ছিল। ছাখ কথা রেখেছি কিনা। বলেছিলাম না গত বছর—সামনের বছর তোমার এখানে বরা শিকার করতে আসব।

সোমেশ্বরদার দিকে তাকিয়ে পীতাম্বর নামক ছায়াটি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। তা মায়েরা যদি জামা-কাপড় বদলাতে চান, আমাদের ছাউনিতে আসুন না কেন। আপনারাও আসুন। একটু খাওয়া-দাওয়া করে শিকারে যাবেন। দ্বীপের পেছনে খুব জঙ্গল বেড়েছে। ওদিকের জমীন থেকে বুনো বরা খুব আসে—পেয়ে যাবেন জঙ্গলে। চলুন।

সবাই উঠে চলল। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। রানীর খালি পায়ের তলায় শুকনো বালি। বালিতে বিশ্রি আঁশটে গন্ধ।

সোমেশ্বরদা বললেন, দিনের বেলা হলে দেখতে পেতে বালির সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ শুঁটকি মাছের গুঁড়ো মিশে আছে। তাই না হে পীতাম্বর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

একটু এগোতেই কতকগুলো হোগলার ছাউনি দেখা গেল। একটু ছাড়া ছাড়া। বেশ বড় বড় খালি জায়গা নিয়ে এক একটা ছাউনি। টর্চ ফেলে দেখছিল রাজেশ আর নটরাজন।

পীতাম্বরের দলের কে যেন বলল, এখানে কি আর বাবুরা থাকতে পারবেন? চারিদিক খোলা।

টর্চ ঘুরে পড়ল সারি সারি ফালি ন্যাকড়া শুকোতে দেওয়া বিস্তারগুলোর ওপর।

— ওগুলো কী? প্রশ্ন করল নূপুরদি।

—আঁজ্ঞে মাছ, মাছ শুঁটকি হচ্ছে...

—এত মাছ?

সোমেশ্বরদা বললেন, এ দ্বীপে মাছ ছাড়া আর কিছু নেই। ওই যে এক একটি ছাউনি ঘিরে খালি কম্পাউণ্ড, ওখানেও মাছ শুকনো হয়। তারপর টর্চ ঘুরিয়ে চালাঘরের সামনে সারি সারি স্তূপ দেখিয়ে বললেন, ওগুলোও শুকনো মাছের স্তূপ...

সুহাসদা সখেদে বললেন, ইসস্, নূপুর কত আশা করে এসেছিল, মার্কেটিং করবে বলে! তাই না নূপুর?

সোমেশ্বরদা হেসে বললেন, হ্যাঁ নূপুর কিছু করাত মাছের করাত আর শংকর মাছের চাবুক নিয়ে যেতে পারো। তার বেশি নয়।

সুহাসদা বললেন, কি সর্বনাশ, আমার পিঠের কথা একদম ভাবছেন না সোমেশ্বরদা! একটু মমতা নেই?

নূপুরদি বলল, কেবল ইয়ারকি, এই তাড়াতাড়ি আমাদের একটা চেঞ্জের জায়গা দেখিয়ে দাও না।

কোথায় চেঞ্জ করবে? সত্যি তো। লণ্ঠন আর টচ এবং হ্যাজাকের আলোয় দেখা গেল ছাউনি কেবল মাথায় ঢাকা দেওয়া। বেশির ভাগ ছাউনিরই চারপাশে দেওয়াল বলে কোন পদার্থ নেই।

নূপুরদি অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, মেয়েরা কোথায় আছে? আমাদের দুজনকে সেখানেই নিয়ে চলুন না হয়!

পীতাম্বর ঘাড় ঝুঁকিয়ে হেসে বলল, মা জননী আমরা তো এখানে চার পাঁচ মাসের জন্যে আসি। তাই মেয়েছেলে, সংসার এ সব ঝামালি আনি না। তবে ওই ওপর বাগে আমাদের একটা ঘর আছে বটে।

নূপুরদি বলল, টর্চটা দেখান তো সোমেশ্বরদা—

অনেক উঁচুতে একটি ছোট্ট হোগলার ঘেরাটোপ। রাজেশ বলল, ওখানে এখন যাবে কে? নূপুরদি, আপনারা বরং একটা আলো নিয়ে ওই মাছের স্তূপের পেছনে চলে যান।

রানী বলল, বাঃ, ভালো বুদ্ধি। তাই চল নূপুরদি। যাবার আগে বলল, এখন বুঝছি আপনি কেন পিঙ্কিকে আনতে চান নি!

রাজেশ বলল, কেন?

—আপনার ডলপুতুলের গায়ে জলকাদা লাগার ভয়ে।

নূপুরদি বলল, ঠিক বলেছিস! বাব্বা, কি গদগদ ভাব!

দুজনে মিলে একটা লণ্ঠন আর জামা-কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে মাছের স্তূপের পাশে চলে গেল। নূপুরদির চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছে।

—অদ্ভুত, না, রে রানী?

সত্যিই অদ্ভুত। শুকনো মাছের স্তূপের খাঁজে আলোটা রেখে রানী জামা কাপড় খুলতে লাগল। লণ্ঠনের আলোয় মাছগুলোর পাৎলা পাৎলা ঈষৎ স্বচ্ছ শরীর দেখা যাচ্ছে। আঁশটে গন্ধ উঠছে একটা। পিছনে অন্ধকার। আর হু হু হাওয়া। রানীকে নূপুরদি একটা ম্যাক্সি পরতে দিল। রবার গার্ডার লাগানো ম্যাক্সিটা যে কোন শরীরেই ঠিকঠাক বসে যায়। তার ওপর কার্ডিগান আর চাদর জড়িয়ে খানিকটা শীত ভাঙল তবু। ভিজে জামা-কাপড়গুলো ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগে ভরে রানী আর নূপুরদি মাছের স্তূপের বাইরে এলো। পীতাম্বরের ছাউনিটি দ্বীপের সব ছাউনির মাঝখানে বাঁশের মাচান করা। মাচানের ওপর ত্রিপল কম্বল বিছিয়ে সবাই বসেছে। কাঠ জ্বেলে ওপর থেকে ঝোলানো এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে চা হচ্ছে।

পীতাম্বর কোন কথাই শুনবে না। চা সে খাওয়াবেই।

সুহাসদা নূপুরদিকে ডেকে পাশে বসালো। বলল, নূপুর, আজ রাতে তুমি আর আমি ওই উঁচুতে হোগলার ঘরটায় থাকব। ওটায় যে থাকে সে আজ রাতে মাছ ধরতে গেছে।

নূপুরদি হাততালি দিয়ে বলল, খুব মজা হবে!

সোমেশ্বরদা হেসে বললেন, এসে পর্যন্ত খালি হনিমুনের ব্যবস্থা হচ্ছে বাবুর শিকারের নাম নেই।

সুহাসদা বললেন, কেন, শিকারও করব হনিমুনও করব।

রানী বসে ছিল রাজেশের পাশে। রাজেশ ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল, বলুন, কেমন লাগছে?

রানীর উত্তেজনার কথা সরছিল না। বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না!

চা এলো। কাপে গেলাশে বাটিতে। যারা চা দিচ্ছিল তাদের একজনের হাত থেকে চা নিয়ে রাজেশ বলল, আপনার নাম কী?

—-আজ্ঞে বিলাস!

—আপনি মাছ ধরেন?

—হ্যাঁ, বছরে চারমাস।

—মাছ ধরে কি করেন?

—-নামখানার বাজারে পাঠাই কিছু। বাকি সব শুঁটকি করি।

সোমেশ্বরদা বললেন, এই দ্বীপটার বেশিটাই বর্ষার সময় ডুবে যায়। তখন এ সব ছাউনি-টাউনির চিহ্নমাত্র থাকে না। তখন এরা কাছাকাছি শহরে গঞ্জে রিকশা টানে, জন মজুরি করে। কেউ বা গাঁয়ে চলে যায়। তাই না বিলাস?

বিলাস বলল আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর টানের সময়কার এই চার মাসে চলে আসি এখানে। যে যার পুরোনো জায়গা খুঁজে নিই। মা মকর-বাহিনীর পূজো করি। আবার ছাউনি করি।

একজন বুড়ো মানুষ উবু হয়ে বসে ছিল কোণে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওই মা, মা-ই আমাদের সব বাবু। মা-ই রাখেন। মা-ই মারেন।

কে একজন বলে উঠল, মাছের নৌকোগুলো যায় বাবু সাগরে আমরা প্রাণ হাতে করে থাকি। এখানকার সমুদ্দুরকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কেমন ভাব। কে ফেরে, কে ফিরে আসে না তার কোন

ঠিকানা নেই বাবু। গেল বছরে তাই, ওই বুড়ো হাসানের একটা মাত্তর ব্যাটা চলে গেল!

রানী রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। যে জগতে সে এত দিন ছিল, সে জগৎটা যে কত ছোট, কত ঘেরা, নগণ্য তা সে জানতই না। আজ এত বড় একটা জায়গায় এসে পড়ে তার যেন দিশাহারা লাগছে। চা খেতে খেতে হাঁটু দুটি হাতে জড়িয়ে সে শুনছিল। সোমেশ্বরদা নূপুরদিকে এই দ্বীপটার কথা বোঝাচ্ছিলেন। মাঝখানে কম্বলের ওপর প্লাস্টিক সিটের ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে বন্দুক রিভলভার কার্তুজ ইত্যাদি। সেখানে কয়েকটা আলো রাখা। তার দ্যুতি নাচছে সবার মুখে মুখে। চা[illegible]শ দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপের বেশ কয়েকজন মানুষ।

সোমেশ্বরদা জলদগম্ভীর গলায় বললেন, বুঝলে নূপুর, অদ্ভুত জায়গা এটা। ভাবা যায় না। একেবারেই সভ্যতার বাইরে। কাট অফ। ডাক্তার নেই, বদ্যি নেই, দোকান-পাট নেই, কিছু না। দ্বীপের ছেলেরা যখন মাছ বিক্রি করতে নামখানায় যায়, তখন রসদ কিনে আনে। ব্যস! ওই যা।

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, সাহেব ঠিকই বলেছেন। একেবারেই সব মা মকরবাহিনীর করুণা। মায়ের ভরসাতেই আছি। দ্বীপের জল-হাওয়া, বাবুরা জানেন, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ঝড়-জল হলেই জীবন নিয়ে টানাটানি।

সঞ্জয় প্রশ্ন করল, কেন? জল উঠে আসে বুঝি?

—হ্যাঁ বাবু, তেমন তেমন হলে, ছাউনি ভেসে যায়।

—তোমরা আগে থাকতে সাবধান হতে পারো না?

—কখনো পারি, কখনো আবার পারিও না বাবু। পুরোনো লোকেরা যদি মেঘ-টেঘ দেখে বলে দেয় ঝড় তুফানের কথা তাহলে বেঁচে যাই। না হলেই গেলাম!

নটরাজন বললেন, কি সর্বনাশ! এই দ্বীপে সোমেশ্বরদা প্লেজার আইল্যাণ্ড বানাতে চেয়েছিলেন আপনি?

সোমেশ্বরদা বললেন, আমি যখন প্লেজার আইল্যাণ্ড বানাতে চেয়েছি নটরাজন, তখন জানবে অনেক হিসেব করেই করেছি। এখন রাত। চারিদিক অন্ধকার, তাই বুঝতে পারছ না। কাল সকালে একবার দ্বীপটা নিজের চোখে দেখো। কি ঝলমলে সুন্দর। এই অবস্থাতেই কি বিউটিফুল যে লাগছে। বীচটা দেখো, সমুদ্রটা দেখো। চমৎকার চওড়া ফ্ল্যাট বীচ। বকখালির চেয়েও ভালো। বেশ সানবাথ করা যায়। দু-একটা জায়গা বাদ দিলে সি-বাথও করা যায়। সমুদ্রের রঙ দেখবে কাল সকালে। একেবারে ডিপ ব্লু। আর ওপরে উঁচু ল্যাণ্ডটা। ওই ল্যাণ্ডে মেকশিফ্‌ট ওপন এয়ার রেস্তোঁরা বানানো যাবে। জামা-কাপড় ছাড়ার জন্যে ঘেরা ঝুপড়ি। ফিশ এ্যাণ্ড চিপ্‌স তো টাটকা টাটকাই মিলবে। আর ড্রিংকস,—টি, কফি···দারুণ দারুণ—কাল সকালে দেখো

রানী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। কিন্তু সবই যেন অবিশ্বাস্য লাগছিল তার কাছে। এই ঘোর শীতে, ঠাণ্ডায় সকালের গল্প। রোদ্দুরের গল্প।

পরণের পোশাকের ভেতর দিয়ে ফালা ফালা হয়ে কেটে যাচ্ছে ঠাণ্ডার তলোয়ার। ছাউনির তলায়, উঁচু মাচানের ওপর পাতা কম্বলও যেন ভিজে জল হয়ে যাচ্ছে। ওদের দলের পুরুষদের পরণে তবু গরম পোশাক আর চামড়ার জ্যাকিনের ধরাচূড়া। অথচ চারপাশে দ্বীপের যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকেরই খালি গায়ের ওপর কেবল পাতলা খদ্দরের বা সস্তা সুতোর র‍্যাপার। কেউ কেউ আবার ছোট ছোট তুলোর কম্বল গায়ে জড়িয়েছে। কোন ভ্রূক্ষেপও নেই। ভয়ঙ্কর শব্দ করে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ঝিঁঝিঁর আওয়াজ যে এমন ক্রমাগত, আর এমন সজোরে হয়, তা রানী জানত না। এই ক'টি ছাউনি মাত্র। আবছা দেখা যাচ্ছে। তার চারপাশে কেবল ঝুঁকে পড়া চাপ চাপ অন্ধকার। অজানা ভূগোল। সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। কেবল বীচের ওপর সমুদ্রের আছড়ে পড়ার শব্দ।

অন্ধকারের মধ্যে কি আছে কে জানে।

রাতের বেলা পিছন দিকের জঙ্গল থেকে বরা বেরোয়। বরা আসে যেন ল্যাণ্ড থেকে।

নূপুরদি পীতাম্বরকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের এখানে সাপ আছে?

—হ্যাঁ। কত রকম সাপ। সমুদ্রের সাপ, ডাঙার সাপ,…কত সময় মাছের সঙ্গেও উঠে আসে। কাল সকালে দেখবেন মা, দ্বীপের বালির সঙ্গে কত সাপ শুখিয়ে মিশিয়ে আছে।

নূপুরদি শিউরে উঠে বলল, কি সর্বনাশ!

পীতাম্বর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, না মা, এখন তো শীতকাল। আপনার ভয় নেই। আর ওপরের ওই হোগলার ঘরটা আমাদের খুব পরিষ্কার। এমনি উঁচু মাচান। আপনারা বিছানা পাবেন। তার ওপর পুরু কম্বল নিয়ে নেবেন কয়েকটা। কোন কষ্ট হবে না।

সুহাসদা হেসে বললেন, নূপুর, লখান্দরের গল্প মনে আছে তো? লোহার বাসরেও যখন ছিদ্র ছিল তখন না জানি হোগলার বাসরে কি হবে?

সোমেশ্বরদা বললেন, দ্যাখ নূপুর, সাপের নাম শুনে তোমার বর কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে।

সুহাসদা বললেন, মোটেই না। বরং খুব পুলকিত বোধ করছি। কেবল বাসরই নয়, ফাইটিং-এর চান্সও পাওয়া যাবে দেখছি। লোহার বাসরের ফুটো দিয়ে ঢুকেছিল কালনাগিনী। হোগলার বাসরের ফুটো দিয়ে তাহলে পাইথন ঢোকা উচিত ওঃ, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! এক হাতে ভয়াত প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরেছি, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার…

সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সুহাসদার কথার ভঙ্গীতে।

নূপুরদি বলল, এখানে কোন তলোয়ারই নেই

সোমেশ্বরদা বললেন, অবশ্য রাতে ওখানে শুতে যাবে তো। তাহলে বরং একটা রিভলভার সঙ্গে নিয়ে নিও… সেটাই সেফটি হবে।

সোমেশ্বরদা বললেন, পীতাম্বর, এবারে তোমরা বরং শুয়ে পড়। চা-টা সবতো খাওয়াই হল। এমনি সময়ে তো তোমাদের আধ-রাত্তির হয়ে যায়।

নূপুরদি বলল, কেন?

—কেন আবার, খামোখা কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কী? ওরা সব বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই খেয়ে দেয় নেয়। তারপর ধুনি-টুনি জ্বেলে গান-টান করে। তাই না পীতাম্বর? সোমেশ্বরদা প্রশ্ন করলেন।

···আজ্ঞে। তবে, আপনারা এসেছেন। ভালো লাগছে তাই।

—না হলে সন্ধ্যে থেকে খুব একঘেয়ে লাগে। রিণরিণে গলায় বলল একটি অল্পবয়সী যুবক।

রানী ফিরে তাকালো। ভীড়ের মধ্যে থেকে আরো একজন কে বলল, আপনারা এসেছেন, আমাদের কত আনন্দ। এমনিতে সারাটা দিন অসুরের মতো খাটি। সন্ধ্যে পড়লেই ব্যাস, আর কিচ্ছু নেই। আপনারা এলেন, এ সব কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

রানার মনের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মতো ছুটে গেল সন্ধ্যেবেলার পার্ক স্ট্রীট। চৌরঙ্গী রাতের কলকাতা। এ সব এদেশের মানুষরা ভাবতেও পারে না।

নূপুরদি বলল, কই, চল, ওপরের ঘরটা কেমন দেখে আসি।

নটরাজন বলল, সে কী! আপনারা কি এখনই চলে যাবেন? সুহাসদা, আপনি শিকারে যাবেন না?

সুহাসদা বললেন, না না, শিকারে আমরা দুজনেই যাব। কিন্তু নূপুর একরাতের সংসারটা যখন দেখতেই চাইছে তখন দেখিয়ে আসি।

পীতাম্বর বলল, ও হরিনাথ, তুই যা একটা আলো নিয়ে।

নূপুরদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না না, কোন দরকার হবে না। আমরা এমনিই যেতে পারব। পারব না? ওই তো সিধে পথ।

নূপুরদি হাত বাড়িয়ে টর্চ জ্বেলে দেখাল রাস্তাটা। এবড়ো-

খেবড়ো বালির স্তূপের মধ্যে দিয়ে একটা মসৃণ সরু শুঁড়িপথ খানিকদূর সোজা গিয়ে তারপর বেঁকে গিয়েছে।

সুহাসদা উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, এসো নূপুর!

নূপুরদি কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল।

নূপুরদি আর সুহাসদা যখন হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল, তখন প্রায় সবাই-ই তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। দুজনকে পাশাপাশি এত মানায়। একেবারে মেড ফর ইচ আদার। ঈশ্বর যেন দুজনকে দুজনের মতো করে গড়েছেন। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে চলেছেন সুহাসদা। লম্বা একহারা, সুপুরুষ। পরণে আঁটো-সাঁটো শিকারের পোশাক। নূপুরদির পরণে কালো বেলবট্‌স, উলের জাম্পার আর কোট।

সোমেশ্বরদা রানীর দিকে ফিরে বললেন, রানীভাই, তুমি ভেবে ছাখ আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে জলকাদার মধ্যে শিকারে যাবে? না ছাউনিতে থাকবে?

রানী বলল, শিকারেই যাব। এখানে একা থাকব কার কাছে?

হঠাৎ আকাশ বাতাস ফাটিয়ে গুলির শব্দ শোনা গেল। একটা, দুটো —। চমকে দাঁড়িয়ে উঠল সবাই।

রাজেশ পাগলের মতো ছুটে গেল ওপর দিকে। সোমেশ্বরদা বিদ্যুৎগতিতে অস্ত্রশস্ত্র ঘেঁটে বললেন, ওরা কী সঙ্গে রিভলভার নিয়ে গেছে নাকি? দেখি, আরে আমার রিভলভারটা? কোথায় গেল? কে নিল? নূপুর? না সুহাস?

আবার আকাশ কাঁপিয়ে উঠল গুলির শব্দ। এবার শশব্যস্তে ছুটল সবাই। কেবল বসে রইল রানী। সমস্ত আলো তাকে ছেড়ে চলে গেল। সমস্ত মানুষ। রানী যেন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছে। তার মাথাটা একবারেই ফাঁকা শূন্য। কেবল তার চোখ দুটো দেখছে চলমান আলোর দৃশ্য। সারা শুঁড়িপথ জুড়ে আলো ছুটছে! আর ভয়ার্ত মানুষের সোরগোল।

—কে ?—কাকে ?

রানীর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ভয় একটু একটু করে নামছে। নূপুরদি ? না সুহাসদা ? সুহাসদা যা নিষ্ঠুর নিশ্চয়ই নূপুরদিকে…

রানীর চোখের সামনে সব কিছু ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট আর ঝাপসা হতে লাগল।

অনেকক্ষণ,—যেন অনন্তকাল পরে একটা ভীড় নেমে আসতে দেখল রানী। ভীড়টা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল ছাউনির তলায়। রানী এবার দেখতে পাচ্ছে সবাইকে। সুহাসদা, নূপুরদি সোমেশ্বরদা, নটরাজন,—কারো পায়ে আলো পড়ছে। কারো বুকে। কিন্তু রাজেশ ?—ওই তো রাজেশ—হেঁটেই আসছে তো। রাজেশের পরনে কালো পোশাক। কালো গামবুট। কালো চামড়ার জাকিন। তার বাঁদিকের বাহুতে একটা শাদা কিছু বাঁধা। তার ওপর কাল্‌চে ছোপ।

রানী উঠে দাঁড়াল এবার।—রাজেশ—ওঁর—ওঁর লাগল কি করে সোমেশ্বরদা ?

সোমেশ্বরদা বললেন, আমি, আমি কিছু জানি না রানীভাই।

পীতাম্বর অস্থির কণ্ঠে বলল, কি হবে বাবু ? আমাদের দ্বীপে তো কোন ডাক্তার নেই।

নটরাজন্‌ বলল, আমার কিটব্যাগে তুলো আয়োডিন সব আছে। রানী আপনি একটু সাহায্য করুন না।

রানী তাড়াতাড়ি কিটব্যাগটা খুঁজতে লাগল কেউ এসে আলো ধরল একটা ! রানী তাকিয়ে দেখল তার আঙুলগুলো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই থরথর করে কাঁপছে।

রাজেশ বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার কিচ্ছু হয় নি। ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

সোমেশ্বরদা বললেন, কি করে বুঝব তোমার কিছু হয় নি ? অন্ধকারে তো আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। পাইলটরা

কোথায়? তাড়াতাড়ি স্পীডবোটগুলো রেডি কর গে। আমরা লঞ্চে ফিরব।

নটরাজন কুশলী হাতে একটা সরু ছুরি দিয়ে রাজেশের জার্কিনটার হাতাটা টেনে কেটে ফেলল। আলো এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজেশ বলে উঠল, সত্যি কিছু হয় নি সোমেশ্বরদা। মাত্র একটা ক্রুইজ—ঘষা লেগে গেছে গুলির। নেহাতই এ্যাকসিডেন্ট।

নটরাজন বানীর কাঁপা কাঁপা হাত থেকে আয়োডিন আর তুলো নিয়ে নিজেই ক্ষতের উপরের রক্ত মুছতে মুছতে বলল, নাঃ, বিশেষ সিরিয়াস কিছু নয়। নেহাতই একটা ছড়ে যাওয়ার মতো।

বানী ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলল, এটা কি করে হল সুহাসদা?

পীতাম্বর আলোটা সুহাসদার মুখের কাছে তুলে ধরতে দেখা গেল সুহাসদা কিছু বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভয়ে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে!

নূপুরদি হঠাৎ বলে উঠল, ও নয়, আমি—আমি রিভলভার চালিয়েছিলাম—

—কেন?

বানীর গলা চিরে গেল যেন। রাজেশের নামের প্রথম অক্ষরটা 'আর' দিয়ে না? তবে কী—? বানীর বুকের মধ্যে 'আর' লেখা রুমালটা বিছের মতো কামড়ে ধরল যেন তাকে।

রাজেশ বলল, আমি বলছি, আমি বলছি শুনুন, নূপুরদি আর সুহাসদা যখন ওপরে যাচ্ছিলেন, অন্ধকারে কোন কিছু দেখে ভয় পেয়ে দুটো গুলি ছোঁড়েন নূপুরদি। আমি যখন ছুটে গিয়ে নূপুরদির হাত চেপে ধরি, তখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে উনি আর একটা গুলি ছোড়েন।

সোমেশ্বরদা বললেন, কিন্তু নূপুর রিভলভারটা, তুমি নিলে কেন?

নূপুরদি এবার কথা বলতে পারল। বলল, আ-আমার, একা ওপরে ওই ঘরে যেতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না।

সুহাসদা এবার বললেন, নূপুর নূপুর, লক্ষ্মীটি, তুমি আর ভয় পেও না।

নূপুরদি বলল,বেচারী রাজেশ!

রাজেশের হাত তখন বাঁধা হয়ে গেছে সে সঞ্জয়কে বলল, সঞ্জু, একটা সিগারেট দাও তো···আঃ, সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্টকে এত বড় করে তোলার কি আছে বুঝি না। সোমেশ্বরদা কি ব্যাপার. আমাদের শিকারের কি হবে?

সঞ্জয় বসু নটরাজনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল. তিনটে গুলি চলল, একটাও মার্ডার হল না? হায় রে।

রাজেশ নূপুরদির কাঁধে তার ডান হাতটি রেখে ঝাকানি দিয়ে হাল্কা গলায় বলল, কী নূপুরদি, এখনো মুখটা গম্ভীর করে আছেন? দেখছেন না—হিন্দি সিনেমার হীরো হবার কি দুরন্ত পসিবিলিটি আমার আছে। আমাকে লক্ষ্য করে তিনটে গুলি ছুঁড়লেন, তাও আমি মরলাম না।

এতক্ষণে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নূপুরদি।—রাজেশ, ভাই, আমার ছেলেমানুষীর জন্যে তোমাকে শুধু শুধু···ছি ছি, আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

নটরাজন বলল, যাক, তাহলে আমাদের বরা শিকার আর হল না।

রাজেশ লাফিয়ে উঠে বলল, কেন হবে না? আমি আগে যাব। চলুন সোমেশ্বরদা।

নূপুরদি তখনো কান্না থামাতে পারেন নি। সুহাসদার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সুহাসদা চাপা গলায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন নূপুরদিকে।

সোমেশ্বরদা এবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর হাল্কা গলায় বললেন, রানী, তুমিও ভাই ওই অস্ত্রশস্ত্রের কাছ থেকে সরে যাও। মেয়েদের আর বিশ্বাস নেই। এখন সুহাস, বল, রিভলভার-রানীকে নিয়ে তুমি হনিমুন করতে রাজি আছ কিনা?

সুহাসদা সলজ্জ মুখে বললেন, ওকে নিয়ে আমি চিরজীবন হনিমুন করতে রাজি থাকব সোমেশ্বরদা। আমার আর কোন ভুল হবে না।

সোমেশ্বরদা এবার নটরাজনের দিকে ফিরে বললেন, বেশ, তাহলে হোয়াট এ্যাবাউট দ্য ওয়াইল্ড বোর হান্টিং? প্রোগ্রাম ক্যানসেল? না চালু?

রাজেশ অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, না না, আমার জন্যে কোন প্রোগ্রাম ক্যানসেল হলে আমি খুব দুঃখ পাব। সত্যি। সোমেশ্বরদা বিশ্বাস করুন—নটরাজন জানে, আমি ভাঙা হাত নিয়ে হরিণ শিকার করেছি......

সোমেশ্বরদা বললেন, এ্যাট্ এনি কেস্ প্রোগ্রাম চালু থাকলেও তুমি কিন্তু যাচ্ছ না রাজেশ। বলে দিলাম।

রাজেশ বলল তাহলে?

—তুমি লঞ্চে ফিরে যাচ্ছ। এক্ষুনি। পীতাম্বর না হয় সঙ্গে যাবে। খানিকটা ব্লিডিং তো হয়েছেই। এত একজারসান ভালো নয় তোমার পক্ষে।

রানী হঠাৎ বলে উঠল, আমি ওঁর সঙ্গে লঞ্চে চলে যাই কথাটা বলেই লজ্জিত বোধ করল রানী।

রাজেশ নরম গলায় বলল, সেই ভালো, আমি তাহলে চলেই যাই। এ যাত্রায় আর শিকার করা হল না।

পাইলট আর রানীর মাঝখানে হেঁটে চলল রাজেশ। সঙ্গে দ্বীপের দু-তিনজন লোক।

সোমেশ্বরদা পিছন থেকে একবার ডাকলেন রাজেশকে।—রাজেশ, মালতীবৌদিকে বিভলবাবের কথা কিছু বলবে না। ভয় পেয়ে যাবে। চুপি চুপি গিয়ে চূড়ামণিকে দিয়ে ফার্স্ট-এইড নিয়ে নিও।

রাজেশ বলল, আচ্ছা।

রানী নেমে যেতে যেতে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল।

আবার শুঁড়ি পথ বেয়ে উঠে যাচ্ছে সুহাসদা আর নূপুরদি। ওদের সঙ্গে কয়েকটি ব্ল্যাঙ্কেট আর লণ্ঠন নিয়ে উঠছে দুজন লোক। • সোমেশ্বরদা, সঞ্জয় আর নটরাজন তৈরি হচ্ছেন কাঁধে বন্দুক নিয়ে।

সমস্ত দৃশ্যটা একটা আলো আঁধারি অবাস্তব মনে হতে লাগল রানীর। তার সামনে এগিয়ে আসছে একটা আছড়ে পড়া ছটফটে সাগর। পায়ের তলার ভিজে বালি ছাপিয়ে লোনা জল উঠছে। স্পীডবোটে উঠে বসল রানী। বাক্সেশকে তুলে দিয়ে পীতাম্বর উঠতে যাচ্ছিল। রাজেশ তাকে বারণ করল। বলল, কোন দরকার নেই পীতাম্বর, তুমি ফিরে যাও। পাইলট আছে, এই দিদি আছে। আমি দিব্যি চলে যাব। লণ্ঠন হাতে লোকটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

একটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকানি দিয়ে ফেটে পড়া ঢেউয়ের মাথা ভেঙে স্পীডবোটটা সমুদ্রে ঢুকে গেল।

সারা গায়ে ঠাণ্ডা জলের স্প্রে, লোনা। স্পীডবোট ঢেউয়ের গায়ে গায়ে চলেছে। রানী এখন ইচ্ছে করলেই অন্ধকার সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তার লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা আপাতত নেই।

তীরের মতো ছুটছে স্পীডবোট। দারুন শব্দে শাদা ফেনা ভেঙে উড়ে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে. খানিকটা যাওয়ার পর পাইলট ফিরে বলল, ওঁরা নতুন দ্বীপে থেকে খুব ভুল করলেন

রাজেশ বলল, কেন?

আকাশের অবস্থা একবার দেখুন।

রাজেশ আর রানী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল ছেড়া ছেড়া মেঘে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে আকাশটা।

রাজেশ বলল, বৃষ্টি হবে নাকি?

পাইলট বলে উঠল, বৃষ্টি ..তার বাকি কথাগুলো স্পীডবোটের শব্দে ওলোট পালট হাওয়ায় হারিয়ে গেল যেন।

রাজেশ আবার জিজ্ঞেস করল, কি বলছেন শুনতে পাচ্ছি না।

পাইলট এবার চেঁচিয়ে বলল, সাইক্লোন,—তুফান হতে পারে।

—সে কী! এই শীতে?

—হ্যাঁ, সেই রকম লক্ষণই তো দেখছি!

রানী বলল, কি হবে?

রাজেশ বলল, হবে আর কী। শিকারটা পণ্ড হবে, আর হনিমুনটা সাকসেসফুল হবে।

রানী বলল, ওপরে, আড়ালে কী ঘটেছিল আমি জানি রাজেশবাবু!

রাজেশ অবাক হয়ে বলল, জানেন?

রানীর মনে ৯০, রাজেশ যন্ত্রণার একটা মৃদু আওয়াজ অতি কষ্টে সামলাল। সে বলল, আপনার কি খুব লাগছে....

—না না, এমন কিছু না। কিন্তু সত্যি বলছেন আপনি জানেন, ওপরে—আড়ালে কি ঘটেছিল?

রানী আস্তে আস্তে ব্লাউজের মধ্যে থেকে ‑য়ন-সুকের রুমালটা বের করে বলল, এটা দেখতে পাচ্ছেন?

রাজেশ বলল, এত অন্ধকারে কিছু দেখা যায়? দাঁড়ান, টর্চটা জ্বালি। রাজেশ টর্চ জ্বেলে রানীর হাত থেকে রুমালটা নিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, 'আর'! বাঃ, চমৎকার এমব্রয়ডারিটা তো! আপনি করেছেন?

রানী রুমালটা রাজেশের হাত থেকে নিতে যেতেই হাত ফসকে একেবারে দূরে সমুদ্রে উড়ে গেল রুমালটা।

রানী বলল, ইসস্, শেষটাও চলে গেল আমার!

রাজেশ বলল, কি শেষ?

রানী বলল, আপনি যেন কিছু বুঝতেই পারছেন না। তাই না? নূপুরদির সঙ্গে আপনার বিয়ের আগে পরিচয় ছিল,—তাই না?

—না। আমি তো নূপুরদিকে এখানে এই লঞ্চেই প্রথম দেখলাম।

—তাহলে নূপুরদি আপনাকে গুলি করল কেন ?

—আমাকে ? রাজেশ হাসল,—তাহলে তো আপনি সত্যিই ওপরে কি ঘটেছে তা ভালো রকম জানেন দেখছি।

রানী বলল, আপনি যে ম্যানেজ দেবার চেষ্টা করছিলেন সেটাও আমার চোখ এড়ায় নি।

রাজেশ হেসে উঠল এবার। —এটা কিন্তু আপনি ঠিকই ধরেছেন। সত্যিই আমি নিজেই অবাক হয়ে ভাবছি, ওইভাবে ম্যানেজ দিলাম কি করে ?

পাইলট আবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, সব্বনাশ, বিষম তুফান আসছে ! লঞ্চ বরাবব পৌঁছতে পারলে হয় !

রানী বলল, তাহলে তো মুশকিল, এই এতটুকু স্পীডবোট.

—না হয় ডুবেই যাব ! কি আছে ! রাজেশ মৃদু গলায় বলল।

রানী বলল, আমি ডুবে গেলে কিছু নয় ; কিন্তু আপনি কেন ডুবতে যাবেন ? পিঙ্কির কষ্ট হবে না ?

রাজেশ বলল, না, হবে না। কিন্তু আপনি ডুবে গেলে কিছু নয় এ কথাটাই বা বললেন কেন ?

রানী বলল, আমার জীবনের কোন মূল্য আছে ?

হাওয়া বাড়ছে। রাজেশ কি যেন একটা উত্তর দিল রানী ঠিক শুনতে পেল না। এবার দূরে খেলনার লঞ্চের মতো জানালায় জানালায় আলো জ্বলা রাজেন্দ্রানীকে দেখা গেল।

রানী বলল, কি বললেন ? আমি শুনতে পেলাম না।

রাজেশ বলল, আজ সন্ধ্যেবেলা আমি পিঙ্কিকে আপনার দুটো চিঠি পড়ে শুনিয়েছি।

রানী মাথা নামাল। লজ্জায় হয় যেন গুটিয়ে গেল সে। ছি ছি দুটিই গোপন চিঠি,—তা এভাবে সকলের চোখের সামনে খুলে গেল ! পিঙ্কি না হয় রানীকে বুঝতে পারে, কিন্তু রাজেশ ? রাজেশ তো পুরুষ। রাজেশ তাকে কতখানি করুণা করবে ?

মরতে চেয়েও যে মরতে পারে না তার চেয়ে বড় ক্লাউন বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ নেই।

রাজেশ রানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলল, এমন নয় তো যে আপনার জন্যেই নূপুরদি আর সুহাসদার মধ্যে—

রানা চমকে উঠে বলল, না না, সত্যি বলছি···আমার জন্যে ওঁদের মধ্যে কোন কিছু হয় নি, বিশ্বাস করুন···

আর কোন কথা হল না। কারণ স্পীডবোট তখন রাজেন্দ্রানীতে পৌঁছে গেছে।

রাজেশ বলল, আমার গায়ে একটা ব্যাপার জড়িয়ে দিন তো। মালতীবৌদি যেন কিছু টের না পান!

ওপরেই চূড়ামণি দাঁড়িয়ে। রানা দেখতে পেল চূড়ামণির রোগা শুকনো চেহারাটা ঝুঁকে আছে একটু। সে রাজেশের গায়ে তার নিজের স্কার্ফটা জড়িয়ে দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওপরে উঠতে, চূড়ামণি বলল, মেমসাহেব, আপনিও নতুন দ্বীপে গিয়েছিলেন?

রানা চাপা গলায় বলল, চূড়ামণি, কেউ জানেন না তো?

—না, আমি ভাবছি আপনারা সব শুয়ে পড়েছেন।

রাজেশ বলল, চূড়ামণি, কোন কেবিন খালি আছে?

—হ্যাঁ, শেষ দিকে একটা ছোট কেবিন আছে সাহেব।

তাড়াতাড়ি চল তো—

—আমিও যাব সাহেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট্ এইড বাক্সটা নিয়ে চলে এসো। আমার হাতটা একটু কেটে গেছে।

চূড়ামণি বলল, সে কী!

রাজেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ, কোন কথা নয়। তুমি তাড়াতাড়ি বাক্সটা নিয়ে এসো। সোমেশ্বরদা সাবধান করে দিয়েছেন মালতীবৌদি যেন কিছুই না জানেন।

চূড়ামণি সঙ্গে সঙ্গে বিনীত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

রানী বলল, চূড়ামণি, মালতীবৌদি কি শুয়ে পড়েছেন?

ফার্স্ট-এড বাক্স আনবার জন্যে এগোচ্ছিল চূড়ামণি। পিছন ফিরে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে সামান্য ইতস্তত করল। তারপর বলল, ওই যে ওই প্যাসেজ দিয়ে চলে যান। একদম শেষের কেবিন। বাইরে একটা ঝোলানো আলো আছে। আমি এখুনি আসছি।

রানী আর রাজেশ এগিয়ে গেল সরু প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটি ঝোলানো আলো একা দুলছে। স্লাইডিঙ দরজা সরিয়ে কেবিনে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল রাজেশ। ছোট এক শয্যার কেবিন। দেয়ালে আঁটা একটি ছোট টেবিল আর একটি বসার চেয়ার। রাজেশ বিছানায় বসল। স্কার্ফটা সরিয়ে দিতেই তার ছেঁড়া হাতার জ্যাকিন, জড়ানো ব্যাণ্ডেজের ভিজে ওঠা রক্তের ছাপ দেখে রানীর আবার খারাপ লাগল। সে বলল, কাল সকালে পিস্কি কত কষ্ট পাবে বলুন তো।

রাজেশের দিকে তাকাতেই রানী দেখল, রাজেশ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রানীর অস্বস্তি লাগল। বিছানায় পড়ে থাকা স্কার্ফটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়াতে যাচ্ছিল রানী, রাজেশ বলল, থাক না!

রানী বলল, কেন?

—আপনাকে একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছে!

রানী চমকে তাকাল নিজের দিকে। তার পরণে নূপুরদির দেওয়া বডিলাইন ম্যাক্সি। হেসে হাল্কা গলায় রানী বলল, আজ সকাল থেকে তাহলে নানা রকম দেখাল আমায়, তাই না? কখনো ঝি-এর মতো, কখনো মেমসাহেবের মতো, কখনো বাচ্চা মেয়ের মতো?

রাজেশ কি বলতে যাচ্ছিল, স্লাইডিং ডোর সরিয়ে ফার্স্ট-এড বক্স হাতে চূড়ামণি ঢুকল!

রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজটা দেখে চমকে উঠে চূড়ামণি বলল, এ কী

সাহেব! খুব লেগেছে দেখছি। তারপর ব্যাণ্ডেজটা খুলতে খুলতে বলল, পড়ে গিয়েছিলেন?

রাজেশ বলল, না।

চূড়ামণি ততক্ষণে ক্ষতটা পুরো খুলে ফেলেছে। তুলোর প্যাডটা সরিয়ে সে বলল, এ তো দেখ গেছে সাহেব!

রাজেশ অনিচ্ছুক গলায় বলল, আসলে চূড়ামণি, একটা গুলি ছুটে গিয়েছিল...

চূড়ামণি ঈষৎ পিঙ্গল চোখে মাথা তুলে তাকিয়ে বলল, গরম জল নিয়ে আসি একটু। একটু ডেটল দিয়ে মুছে নিলে ভালো হবে।

চূড়ামণি চলে ে তেই রানী বলল, খুব লাগছে আপনার, না?

—নাঃ, এখন আর লাগছে না বিশেষ। খানিকক্ষণ বেশ জ্বালা করছিল অবশ্য।

গরম জল নিয়ে ভিতরে এলো চূড়ামণি। তুলো দিয়ে রক্ত মুছতে আরম্ভ করতেই রাজেশ এত উঃ! আঃ! শুরু করল যে রানী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।

প্রায় পালিয়েই এলো রানী। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার ডেকে সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়াল রানী।

অদ্ভুত একটা হাওয়া উঠেছে। সমুদ্রের কালী গোলা জল অস্থির দুলছে। দোলনটা বোঝা যাচ্ছে এই জন্যে যে ঢেউগুলো পাগলের মতো শাদা ফেনা কাটছে। লঞ্চটাও আন্দোলিত হচ্ছে আস্তে আস্তে। রানী মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। চূড়ামণি কাছে এসে ডাকতে রানীর সম্বিত ফিরল।

রানী পিছন ফিরে চূড়ামণিকে দেখে বলল, ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। বিশেষ কিছু নয়। তবে একটা ইঞ্জেকসন্ দিতে পারলে ভালো হত।

চূড়ামণির সঙ্গেই রাজেশের কেবিনে এলো রানী। রাজেশ বিছানায় বসে ছিল। বলল, আসুন। কোথায় চলে গিয়েছিলেন?

একটু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি! এবার বরং শুতে যাওয়া যেতে পারে।

—বসুন না একটু। পরে যাবেন এখন।

চূড়ামণি বলল, সাহেব আমি এবার যাই তাহলে?

—হ্যাঁ, যাও।

—আরাম পাচ্ছেন তো এখন?

—হ্যাঁ চূড়ামণি, ঠিক আছে।

চূড়ামণি চলে যাওয়ার পর রানী রাজেশের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হাসল,—বসে বসে কী করব?

—কেন, গল্প করুন।

—আমার কোন গল্প নেই। আপনিই বরং বলুন, কি হয়েছিল সুহাসদা আর নূপুরদির মধ্যে…

—নূপুরদি স্যুইসাইড করতে যাচ্ছিলেন।

—সে কী!

—হ্যাঁ! বাঁক ঘুরে আমাদের চোখের আড়াল হতেই নূপুরদি দু-একটা কথা বলার পর হঠাৎ রিভলভার তুলে ধরলে, সুহাসদা ধরে ফেলেন নূপুরদিকে। তারপর আমি গিয়ে পড়ি। আমি রিভলভারটা কেড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে যায়।

—নূপুরদি হঠাৎ কেন নিজেকে...বলতে গিয়েই রানীর মনে পড়ল নূপুরদির স্লীপিং পিলের শিশি সরিয়ে নেওয়া…

রাজেশ বলল, খুব একটা অভিমানের ব্যাপার বলে মনে হল। নূপুরদিকে কোন কারণে সুহাসদা হার্ট করেছিলেন, অবিশ্বাসও করেছিলেন হয়তো, সেইজন্যে…মানে, আমি তো সবটা শুনি নি, যতটা ওঁদের কথার মধ্যে বুঝতে পারলাম তাই বলছি আর কি।

রানীর মনের মধ্যে সব ছবিগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। নূপুরদি বলেছিল, সুহাসদার ধারণা সুহাসদার সঙ্গে ডিভোর্স হলে নূপুরদি রঞ্জনকে বিয়ে করবে। সেই ধারণাটাকেই মিথ্যে

করে দিতে চেয়েছিল নূপুরদি। বেচারী! কিন্তু এ কথা তো রানী কোন দিন রাজেশকে বলতে পারবে না।

রাজেশ কোমল গলায় বলল, কী, কোন কথা বলছেন না যে?

—কি বলব?

রাজেশ বলল, আজ সারাটা দিন আমার ওপর দিয়ে যে কত কী গেছে তা আপনি যদি জানতেন!

রানী অবাক হয়ে তাকাল। রাজেশ যেন ঠিক তার মনের কথাটাই বলছে। বেশ তো?

—আপনাকে যদি সব বলা যেত!

রাজেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রাণীর ভিতরটা যেন কেমন পুড়ে যেতে থাকল। মনে মনে রানী বুঝতে পারল এ ঘরে বসে থাকা উচিত হচ্ছে না তার। বাজেশ এই লঞ্চে এসেছে পিঙ্কির সঙ্গে আলাপ করতে। সকাল থেকে পিঙ্কি রাজেশ একসঙ্গে ঘুরেছে বেড়িয়েছে, পাশাপাশি বসে খেয়েছে, রেডিও শুনেছে, তারপর পিঙ্কির শরীর খারাপ হতে পিঙ্কির সঙ্গে একা কেবিনে কাটিয়েছে দুজনে। রানীর ব্যাগ থেকে চিঠি নিয়ে দুজনে মিলে পড়েছে, মিলিত ভাবে হায় হায় করেছে, তবে হঠাৎ এখন রানীর সঙ্গে এত মোলায়েম ব্যবহার কেন? দয়া করছে রাজেশ?

রানী মাথা তুলে বলল, আমাকে সব বলা যায় না রাজেশবাবু। আজই তো আলাপ হল আপনার সঙ্গে। যাকে বলা যায়, তাকেই সব বলবেন। কাল সকালেই পিঙ্কির সঙ্গে দেখা হবে আপনার, তাই না?

রাজেশ কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

রানী বলল, আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?

রাজেশ বলল, শুনেছিলাম তো পিঙ্কির বাবা মায়ের ইচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি যেন বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পর কোথায় হনিমুনে যাবেন? স্কার্ফটা কোলের ওপর বিছিযে সমান করতে করতে হাস্যোজ্জ্বল চোখে চাইল রানী।

—ইয়োরোপ!···অবশ্য এ সব পিঙ্কির বাবা মা'র ইচ্ছে! আমার ইচ্ছে ছিল অন্য রকম।

—আপনার ইচ্ছে আমি জানি।

—জানেন?

—হ্যাঁ, নটরাজন বলছিলেন নীলগিরি নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা!

রাজেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, সত্যি কিন্তু! আপনি যদি একবার নীলগিরি যেতেন! যাবেন? আমি আপনাকে নীলগিরি দেখাতে চাই।

রানী উঠে দাঁড়াল। স্কার্ফটা গায়ে জড়িয়ে বলল, এবার শুতে যাই। রাত অনেক হল, আপনি এখন শুয়ে শুয়ে নীলগিরিতে হনিমুনের স্বপ্ন দেখুন।

রাজেশের দিকে পিছন ফিরতেই রানীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট কামড়াল সে। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষই কি সুযোগ পেলেই মেয়েদের সঙ্গে এমনি ফ্লার্ট করে?

রানী যখন স্লাইডিং দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, গুডনাইট, চলি— রাজেশ হঠাৎ তাকে মরিয়ার মতো ডাকল, শুনুন, রানী—

রানীর নাম ধরে এই প্রথম ডাকল রাজেশ। রানী চমকে ফিরে তাকাতেই শান্ত কণ্ঠে রাজেশ বলল, পিঙ্কির সঙ্গে কিন্তু আমার বিয়ে হচ্ছে না।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানী সজোরে দরজাটা টেনে দিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, মেলায় পিঙ্কিও ঠিক এমনি একটা কথাই যেন বলেছিল।

···কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল রানী খেয়াল নেই।

ঘুমের মধ্যেই কেমন যেন উথাল পাথাল করছিল শরীরটা। হঠাৎ জেগে উঠতেই সে টের পেল ঘুমের মধ্যেকার উথাল পাথাল দোলাটা ছেড়ে যায় নি তাকে। লঞ্চটা রীতিমত দুলছে। কাচের জানালায়

ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে হাওয়া। বৃষ্টির ছাটে টক্‌ টক্‌ শব্দ হচ্ছে জানালার বাইরে।

নলিনীপিসিও উঠে বসেছেন।

রানী বলল, বাইরে দারুণ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে নলিনীপিসি।

নলিনীপিসি বেড লাইটটা জ্বেলে দিয়ে বললেন, শুধু ঝড় নয় রানী। সাইক্লোন।

রানী তাড়াতাড়ি কাঠের শাটারগুলো টেনে দিল। নলিনীপিসি বললেন, শাটার টেনে কি করবে রানী? আমাদের লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে বে অব বেঙ্গলের হাঁ-করা মুখের ওপর। কতখানি জায়গা জুড়ে মাইল মাইল হাওয়া ছুটে আসছে বল তো? এই ঝড়ের মুখে রাজেন্দ্রানী একদম হেলপ্‌লেস কাগজের নৌকোর মতো!

রানীর সমস্ত শরীর জুড়ে একটা ভয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। উঠে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো রেডিয়ম অক্ষরের ঘড়িতে রানী সময় দেখল: রাত তিনটে।

নতুন দ্বীপের কথা ভাবতে গিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল সে। নূপুরদি, সুহাসদা, সোমেশ্বরদা, নটরাজন, সঞ্জয়। রানী দরজা সরিয়ে বাইরে এলো। লঞ্চ এত দুলছে যে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। কোন মতে কাঠের দেওয়াল ধরে ধরে সে মালতীবৌদির কেবিনের দিকে গেল। দরজায় দুলছে,—প্লীজ ডু নট ডিসটার্বের কার্ডটা। সঙ্গে সঙ্গে রানীর মনে পড়ে গেল এ ঘরে ঘুমোচ্ছে পিঙ্কি। সে তাড়াতাড়ি পিঙ্কির কেবিনের দিকে ছুটল। কেবিনের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দেখল মালতীবৌদি কেবিনে নেই। তাড়াতাড়ি ছুটে ফিরে আসতে গিয়ে দেখে সিঁড়ির মুখে মালতীবৌদি। নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছেন।

তাঁর সারা শরীরে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলার ছবি। ল্যাপটানো কাজল, খসে পড়া বাগান খোঁপা, বেঁকে যাওয়া টিপ। স্খলিত শাড়ি।

রানীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, কী ভীষণ সাইক্লোন, কি হবে রানী?

রানী সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মালতীবৌদির বসে যাওয়া চোখের কোলে গভীর দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

—জানো রানী, সাইক্লোন হলে নতুন দ্বীপের নীচু জায়গাগুলো একেবারে হাই-সি-র নীচে চলে যায়।

রানী বলল, উঁচু জায়গাও তো আছে মালতীবৌদি। ওঁরা নিশ্চয়ই সবাই সেখানে চলে যাবেন। আপনি অত ভাববেন না।

রেবতীপিসিও নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন ততক্ষণে। রানী চিরকালই দেখেছে ওঁর ঘুম খুব হাল্কা।

মালতীবৌদি ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, মাসিমা, আমি জানি, উনি আমায় আগেই বলেছেন, সাইক্লোন হলে নতুন দ্বীপের প্রায় অর্ধেকটাই জলের তলায় চলে যায়।

রেবতী পিসি বললেন, সে কী! তাহলে নূপুর, সুহাস?

মালতীবৌদি চিৎকার করে প্রায় কেঁদে উঠলেন। আকুলি বিকুলি কান্না। চূড়ামণি ছুটে এলো। নীচ থেকে কয়েকজন চাকর বেয়ারা মাল্লাও ওপরে চলে এলো। রানী অবাক হয়ে ভাবছিল এত ঝড়ে রাজেশ কি করে ঘুমোচ্ছে! সে চূড়ামণিকে বলল, রাজেশবাবু কি উঠেছেন চূড়ামণি?

—না, ওঁর ব্যথা করছিল বলে ঘুমের বড়ি দিয়েছি একটা। একটু ঘুমোনো ভালো!

রেবতীপিসি বললেন, রাজেশ লঞ্চে? ও না নতুন দ্বীপে গিয়েছিল ওঁদের সঙ্গে?

রানী বলল, মাথা ধরেছিল বলে বোধ হয় ফিরে এসেছিলেন।

মালতীবৌদি প্যাসেজের মধ্যেই বসে পড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রানী আর রেবতীপিসি কোনো রকমে তাঁকে নিয়ে পিঙ্কির কেবিনে বিছানায় শুইয়ে দিল। রানীর ঠোঁট কিন্তু মালতীবৌদিকে ছুঁতে গিয়ে ঈষৎ ঘৃণায় বেঁকে যাচ্ছিল। যেন পচা মাছের শরীর। এত চোখের জল, সব নিজের মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা স্বামী দেবতাটিরই

জন্যে। একটি কৌটাও যে নটরাজনের বরাদ্দ নয় সে-কথা রানী বুঝতে পারছিল।

মালতীবৌদিকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার আগে চোখের কোণ দিয়ে রানী দেখেছিল, মালতীবৌদি দেয়ালে আটকানো লকার থেকে সার সার বোতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন।

বাইরে এসে রেবতীপিসি চাপা গলায় বললেন, কি হবে বল্‌তো রানী?

রানী বলল, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে স্পীড-বোটে চড়ে নতুন দ্বীপে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেক উঁচু জায়গা আছে। নূপুরদি, সুহাসদা যে হোগলার ঘরে থাকবেন সেটা একেবারে উঁচুতে। সেখানে জল যাবে না।

রেবতীপিসি ফ্যাকাশে হেসে বললেন, জল হয়তো যাবে না, কিন্তু ঘরটাই হয়তো উড়ে যাবে!

সাইক্লোন তখন সারা লঞ্চটাকে যেন দু'হাতে ধরে ঘূর্ণিপাক খাওয়াচ্ছে। রেবতীপিসি ঠাণ্ডা, শান্ত মানুষ। মালতীবৌদির মতো হিস্টিরিয়া তাঁর নেই। তবু তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না। এগিয়ে গিয়ে একেবারে খোলা ডেকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। রানীকে লক্ষ্য করে কি যেন বললেন। তাঁর অর্ধেক কথাই হাওয়ায় ওলোট-পালোট খেতে খেতে হারিয়ে গেল। যেটুকু শোনা গেল, তা হল অজিত পেসেপশাই হার্টের রুগী। তিনি ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে যেন আচমকা না জাগানো হয়।

রানী দেখল ভূতগ্রস্তের মতো ঝমঝম বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেবতীপিসি খোলা ডেকের শেষ প্রান্তে চলে যাচ্ছেন। রানী একবার তাঁকে আটকাতে গেল। কিন্তু এ অবস্থায় আটকানো যায় না। রেবতীপিসি যেন যতটা পারেন, ততটা কাছে যেতে চাইছেন নূপুরদির। প্যাসেঞ্জের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একা ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা অনুভব করতে লাগল রানী।

নলিনীপিসিও দরজা সরিয়ে বাইরে এলেন।

—রানী, রেবতী কি উঠে পড়েছে? ওর গলা শুনলাম যেন?

রানী ইশারায় দেখিয়ে দিল রেবতীপিসিকে। কড় কড় করে বাজ পড়ছে। বিদ্যুচ্চমকের নীল্‌চে তীব্র আলোয় মাঝে মাঝে সমস্ত ডেকটা আলোময় হয়ে উঠছে বৃষ্টির পর্দার ওপাশে আবছা দেখা যাচ্ছে রেবতীপিসিকে। রেলিং ধরে ডেকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন

নলিনীপিসিও প্রায় টলতে টলতে চললেন রেবতীপিসিব দিকে।

আকাশে বিদ্যুৎ চিক্কর দিচ্ছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে বানী দেখল রেবতীপিসি একবার ফিরে তাকালেন নলিনীপিসির দিকে। তাবপব দুজনে দুজনকে যেন কাছে টেনে নিলেন।

‘শ্রাবণ-সখী,’ কথাটা মনে পড়ে গেল রানীব। ভাবী সুন্দব কথা। পোড়ো আমবাগানে দুটি বৃষ্টি ভেজা ভীত বালিকাব বিদ্যুতেব আলোয় ফুটে ওঠা নীল্‌চে ছবি!

লঞ্চের ভিতব চূড়ামণিব নেতৃত্বে সবাই ছোটাছুটি করে লঞ্চ সামলাচ্ছিল। নীচে মাল্লারা কাজে ব্যাস্ত। বানী চূড়ামণিকেই শেষ পযন্ত ধরল, বলল, ওই যে ওঁরা ওখানে ভিজছেন, ভিতরে ডেকে আনো চূড়ামণি।

চূড়ামণি আর রানী ছাতা নিয়ে ডেকেব দিকে যেতে চেষ্টা করল। হু-হু বাতাসে ছাতা-টাতা হাতে থাকে না। অগত্যা তারা ভিজতে ভিজতেই চলল ডেকেব প্রান্তে। রেবতীপিসি আর নলিনীপিসিকে নিযে এলো ভিতবে।

রানী বলল, বৃষ্টিতে ভিজে কী হবে? নলিনীপিসি, আপনার না কোল্ড এ্যালার্জি আছে। আমাদের কেবিনে গিয়ে দুজনে শাড়ি-টাড়ি বদলে নিন আমি এখুনি গরম জল নিয়ে আসছি।

ভিজে পোশাক বদলে নিল রানী। তারপর নীচে গিয়ে গরম জল পাঠিয়ে দিল নলিনীপিসির কেবিনে।

এতক্ষণে জার্নালিস্ট বাবু দুজনের কথা মনে পড়ল রানীর, তাঁদেরও তো কোনো পাত্তা নেই।

চূড়ামণি শুকনো কাপড় পরে ওপরে এলে রানী তাদের কথা জিজ্ঞেস করল চূড়ামণিকে। অত দুশ্চিন্তার মধ্যেও চূড়ামণির ঠোঁটে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। সে বলল, বাবু দুজন ডাইনিং কেবিনের টেবিলেই পড়ে আছেন। আর উঠতে পারেন নি।

রানীর কেবিনে রেবতীপিসি আর নলিনীপিসি শুয়ে আছেন। রানী কোথায় যায়? সে একবার মালতীবৌদির কেবিনের দরজাটা টেনে খুলল। দেখল মালতীবৌদি দুশ্চিন্তা ভোলার ভালো ওষুধ খুঁজে নিয়েছেন। উনি প্রায় অচৈতন্যের মতো কেবিনের মেঝেতে পড়ে। লঞ্চের টালমাটাল দোলনের সঙ্গে খালি বোতলটাও সারা মেঝেতে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

ক্লান্তিতে রানীর সারা শরীরটা বাঁশপাতা হয়ে কাঁপছিল। সে পিঙ্কির জন্যে সাজিয়ে রাখা নরম বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে অর্ধচেতনার মধ্যেই রানী টের পাচ্ছিল, বাতাসের বেগ কমে আসছে। লঞ্চের দুলুনি কমছে। বৃষ্টির ছাটও। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি যেন তাকে বিছানার সঙ্গে গেঁথে রাখছিল। নিজেকে ক্লান্তির হাতে ছেড়ে দিতে দিতে রানী আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানী যখন জেগে উঠল তখন চারিদিক শান্ত। কাচের জানালা দিয়ে ভূতগ্রস্ত একটা সকাল উঁকি দিচ্ছে। মেঝেতে পড়ে থাকা মালতীবৌদিকে ডিঙিয়ে সে সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বেরোল। পরণের শাড়ির আঁচলটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই রানী দেখল পর পর দুটো স্পীডবোট আসছে। খুব শীত করছিল রানীর। তবু যতক্ষণ না স্পীডবোট দুটো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে রানী দাঁড়িয়ে রইল। এবার চেনা যাচ্ছে মানুষগুলোকে। সোমেশ্বরদা, সঞ্জয়, নটরাজন। ওই পিছনে নূপুরদি, সুহাসদা!

রানী নিশ্চিন্ত মনে একটা চাদর আনবার জন্যে পিছনে ফিরতেই

দেখল রাজেশ তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার দীর্ঘ একহারা শরীর আর ঘুমের মুখে ভোরের টলটলে কোমল আলো। রানী আনন্দে হেসে উঠে বলল, এবার পিঙ্কিকে ডেকে আনতে পারি, কি বলেন?

ছুটতে ছুটতে চলল রানী। পিঙ্কির কেবিনের দরজার সামনে থেকে 'প্লিজ ডু নট ডিসটার্ব' লেখা বোর্ডটা খুলে নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে বলল, পিঙ্কি, শিগগির ওঠ দেখি. তোমাকে এখন আমি ডিসটার্ব করতে এসেছি!

বিছানায় শোয়া চাদর ঢাকা ব্যাপারটা দেখে কেমন সন্দেহ হল তার। কেমন যেন অস্বাভাবিক। রানী ছুটে গিয়ে লেপটা তুলে দেখল তলায় কতকগুলো বালিশ সাজিয়ে ঢাকা দেওয়া।

রানী পিছু হঠতে হঠতে সরে এলো। বাইরে বেরিয়ে দেখল বিধ্বস্ত সোমেশ্বরদা উঠে আসছেন। তিনি রানীর দিকে রাজেশের দিকে তাকালেনও না। সোজা চলে গেলেন মালতীবৌদির ঘরের দিকে। নটরাজন আর সঞ্জয় ওদের কাছে এসে রাজেশকে বলল, কি—এখন কেমন আছ?

রাজেশ বলল, তোমরা কেমন ছিলে—তাই বল না?

নটরাজন বলল, একদম শেষ হয়ে গেছি রাজেশ! আর কথা বলতে পারছি না। কোথায় শোওয়া যায় আগে একটু বল তো।

রাজেশ ইশারায় নিজের কেবিনটা দেখিয়ে দিল। নটরাজন আর সঞ্জয় প্রায় টলতে প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গেল।

রানী তখনই নীচু গলায় রাজেশকে বলল, পিঙ্কি ওর কেবিনে নেই, আপনি জানেন ও কোথায়?

রাজেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সে কী! কোথায় গেল পিঙ্কি?

রানী বলল, এই সমুদ্রের মধ্যে কোথায় আর যেতে পাবে পিঙ্কি?

সুহাসদা আর নূপুরদি সিঁড়ি দিয়ে ওপর দিকে উঠে আসছিল। ঝড়ের চিহ্ন ওদের চেহারায়। কিন্তু দুজনেই দুজনের ভিতরে যেন

ডুবে আছে। রাজেশ আর রানী ওদের দেখে চুপ করে গেল সুহাসদা বললেন রাজেশ, কেমন আছ এখন ?

নূপুরদি রাজেশের হাত দুটি ধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, রাজেশ নূপুরদিকে কিছু বলতে না দিয়ে বলল, বলুন নূপুরদি, ঝড় তুফানে নতুন দ্বীপে কি রকম হনিমুন হল ?

মাথা হেলিয়ে নূপুরদি বলল, খুব ভালো লেগেছে রাজেশ। এ্যাড-ভেঞ্চারাস ! রোমান্টিক !

রানী বলল, রেবতীপিসি কত ভাবছিলেন তোমাদের জন্যে, যাও আগে দেখা করে নিশ্চিন্ত করগে…

নূপুরদি আর সুহাসদা এগিয়ে যেতে, রানী রাজেশের দিকে ফিরে তাকাল। রাজেশ বলল, ও কী কলকাতায় চলে গেল ?

—কলকাতায় ? কলকাতায় কি করে যাবে ?

—কেন 'স্বাগত'য় চড়ে।

—কিন্তু কেন যাবে ? আমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসে না বলে ও একা একা ফিরেই বা যাবে কেন ?

রাজেশ বলল. যদি বলি, ওর বাবা মা জোর করে ওকে 'রাজেন্দ্রানী'তে পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের পরে যাতে কলকাতা কেন ভারতবর্ষ থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাই ইযোরোপে 'হনিমুন' !

রানী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, কেন ?

—দেখুন, পিঙ্কি প্রথম আলাপের পরই ওর সব কথা আমাকে সরল ভাবে খুলে বলেছিল। তাই অত তাড়াতাড়ি আমরা দুজনে অত বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। আসলে ও ওর প্রফেসর ডক্টর সামসুল আলমকে ভালোবাসত।

—সামসুল আলম। যিনি কাল মারা গেছেন ? রেডিওতে শুনছিলাম ?

—হ্যাঁ তিনিই। তিনি বয়স্ক, বিবাহিত এবং অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও পিঙ্কি তাঁকে পাগলের মতো ভালোবাসত। সত্যিই আর

কাউকে বিয়ে করা পিঙ্কির মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাল দুপুরে খাবার টেবিলে বসেই ও প্রথম ডক্টর আলমের মৃত্যুর খবর শোনে। আমিও শুনি। তারপর মালতীবৌদির কেবিনে গিয়ে সে কি কান্না।...ওর বাবা মা জোর করে ওকে রাজেন্দ্রানীতে তুলে দিয়েছিলেন, যাতে আমার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হলে ওর মন ঘুরে যায়। কিন্তু সব কিছুই কি আর ফরমুলায় বাঁধা যায়? বলুন?

রানী বলল, যায় না। সত্যিই যায় না! কিন্তু পিঙ্কি কেন আপনাকে কিংবা আমাকে না বলে চলে গেল? আমরা তো ওর বন্ধুই ছিলাম।

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, তা অবশ্য সত্যিই!

রানী বলল 'স্বাগত' কোন্ দিক থেকে আসবে? চলুন, ডেকে গিয়ে দাঁড়াই আমরা।

রানী আর রাজেশ এগিয়ে গেল ডেকের শেষ প্রান্তের দিকে। রানী দেখল সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদি আসছেন। মালতীবৌদি চোখ-মুখ ধুয়ে কিছুটা সামলেছেন বাকিটা সোমেশ্বরদাকে পেয়ে। দুজনেই সুখে পরিতোষে যেন ঝলমল করছেন। ঝড়ের আর কোন চিহ্নও নেই চেহারায়।

রাজেশ বলল, কা:কের রাতটার কথা সত্যি কখনো ভুলব না আমি। মাঝে মাঝে এমনি ঝড় আর দুর্যোগের রাত আমাদের সত্যিই দরকার, বলুন আপনি!

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল রানী। সত্যি, কি গভীর প্রসন্ন নীল রঙটি সমুদ্রের। আকাশ সদ্য ধোয়া ফিকে গোলাপ রঙের। চারিদিকে কত শান্তি। কাল রাতে কয়েকবার একা সে সমুদ্রের খুব কাছে এসেছিল। খুব সুযোগ ছিল তার সমুদ্রের জলের মধ্যে অনেক নীচে অনেক দূরে চলে যাওয়ার।

কেন যায় নি?

তার ভিতরে কি কাল থেকেই একটা অন্য অনুভূতি, একটা

আলাদা সত্তার কাজ করতে আরম্ভ করেছিল? রাস্তার বায়োস্কোপের বাক্স ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল সত্যিকার সত্তর মিলিমিটারের সিনেমা? স্টিরিওসাউণ্ডের ঝনাৎকার সমেত? পৃথিবীর একটা এতটুকু টুকরোয় এত বৈচিত্র্য এত তোলাপড়া, এত টালমাটাল?

রানী বুঝতে পারল সেও একটা ভয়ঙ্কর সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সাইক্লোন যখন চলে যায় তখন শান্ত জলে, নীল আকাশের তলায় ভাসতে থাকে মরাকাঠ, ছেঁড়া সংসার আর নষ্ট ছাউনি।

রানীর ভিতর থেকেও তেমনি মৃত্যুর প্রবল প্রতাপান্বিত একটা ইচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে দূরে চলে গেছে। অদৃষ্ট রানীকে অদ্ভুত ভাবে নির্বাচন করে ক্রমশ টেনে আনছে জীবনের কাছাকাছি।

সোমেশ্বরদা আর মালতীবৌদি এগিয়ে এলেন। মালতীবৌদি রাজেশ আর রানীকে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, ব্যাপার কী? পিঙ্কি এখনো ওঠে নি?

রানী বলল, আমি ঠিক জানি না মালতীবৌদি।

কিছুতেই আসল কথাটা বলতে পারল না রানী। সে দেখল রাজেশও অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। সোমেশ্বরদা এগিয়ে গিয়ে রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখলেন তারপর চিন্তিত হয়ে বললেন, এ কী! আলির লঞ্চটা কোথায় গেল?

মালতীবৌদি আর রাজেশও ঝুঁকে পড়ে দেখল। 'রাজেন্দ্রানী'র যেদিকে আলির লঞ্চটা বাঁধা ছিল, সেদিকটায় কিছু নেই। মালতী-বৌদি বললেন, কী ব্যাপার? আলির লঞ্চটা কি ঝড়ে ভেসে চলে গেল কোথাও? না ডুবে গেল?

সোমেশ্বরদা চিৎকার করে ডাকলেন রাজেন্দ্রানীর মাল্লাদের।

তিন-চারজন ছুটে ওপরে উঠে এলো। তাদের মধ্যে একজনকেই চেনে রানী। চমৎকার চেহারার সিরাজুল। আলির লঞ্চের খোঁজ করতেই সিরাজুল বলল, 'স্বাগত'-র কাল রাতেই ফেরার কথা ছিল

মিষ্টিজল নিয়ে। আলি নিজে গিয়েছে 'স্বাগত'য়। কিন্তু কাল সারারাত 'স্বাগত' ফেরে নি। ফেরার মতো আবহাওয়াও ছিল না কাল। মাল্লারা সন্দেহ করছে যে সাইক্লোনে পড়ে পথ হারিয়ে, 'স্বাগত' চলে গেছে অন্য কোন দিকে। তাই সামান্য জখম থাকা সত্ত্বেও আজ ভোরবেলায় সিরাজুল আলির লঞ্চটাতেই দু-চারজন লোক দিয়ে খুঁজতে পাঠিয়েছে দিক ভুল করা 'স্বাগত'কে।

সিরাজুলের কথায় সোমেশ্বরদা কিছুটা শান্ত হলেও তাঁর কপালে জেগে রইল ঘোর উৎকণ্ঠার ভ্রূকুটি। তিনি বললেন, আমি তো খুব ভয় পাচ্ছি মালতী। ছি ছি রাজেশ, তোমাদের লঞ্চের যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমি কি করে মুখ দেখাব বল তো?

রাজেশ বলল, না, লঞ্চ সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেলে আপনি আর কি করবেন?

সোমেশ্বরদা বললেন, সিরাজুল, তুমি আমাদের লঞ্চটাও চালু করে দাও। ফিরেই যাই আমরা, কি বল মালতী?

মালতীবৌদি সোমেশ্বরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যা বলবে তাই-ই হবে, এ আর বেশি কথা কী?

লঞ্চের ভিতরে আবার জেগে উঠল ধক ধক শব্দ।

নীল জলের উপর শান্ত 'রাজেন্দ্রানী' সাঁতার দিচ্ছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সোমেশ্বরদা, মালতীবৌদি রাজেশ আর রানী।

লঞ্চ চলতে শুরু করতেই একে একে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন সুহাসদা, নূপুরদি, নলিনীপিসি, রেবতীপিসি। সঞ্জয় আর নটরাজনও চলে এলো। সাংবাদিক দুজনের একজন অতিকষ্টে এসে দাঁড়ালেন একটু তফাতে। মালতীবৌদি আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে অস্থির গলায় বললেন, পিঙ্কি? পিঙ্কি এখনো উঠল না কেন? আমি বরং যাই। ওকে উঠতে বলি—

মালতীবৌদি এগোতে যাবেন এমনি সময় সিরাজুল নীচ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, সাহেব, ওই যে, দূরে, দেখুন!

সবাই তাকিয়ে দেখল দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো ফুটে উঠছে পাশাপাশি ছুটি লঞ্চ। একটি বড় আর একটি ছোট।

হাঁফ ছাড়লেন সোমেশ্বরদা। রাজেশ আস্তে নিজের করতল দিয়ে রানীর আঙুলে চাপ দিল। চাপা গলায় বলল, এবার পিঙ্কির পালানোর খবর ধরা পড়ে গেল বলে।

রাজেশের চুপি চুপি কথা বলা আর রানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্যটা মালতীবৌদির চোখ এড়াল না। তিনি আর দাঁড়ালেন না। সোজা চললেন পিঙ্কির কেবিনের দিকে।

লঞ্চ ছুটি ততক্ষণে রাজেন্দ্রানীর কাছে এসে গেছে। ছুটি লঞ্চের ডেকেই মাল্লারা স্থির ছবির মতো দাঁড়িয়ে। যেন বড় বেশি স্থির। বড় বেশি শান্ত।

'স্বাগত' আর আলির লঞ্চ যখন রাজেন্দ্রানীর গায়ে এসে অল্প ধাক্কা দিয়ে জুড়ে গেল, তখনই মালতীবৌদি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে সোমেশ্বরদার একটা হাত চেপে ধরলেন। মুখে ঘোর আতঙ্কের ছাপ।

—শোন, পিঙ্কি ওর কেবিনে নেই!

—সে কী!

—হ্যাঁ। লেপ চাপা দিয়ে কতকগুলো বালিশ সাজিয়ে রাখা।

এক মুহূর্তের জন্যে যেন টলে উঠলেন সোমেশ্বরদা। পরমুহূর্তেই তাঁর চোখে এক অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ খেলে গেল। কি যেন একটা আন্দাজ করে নিয়ে তিনি ছুটে নেমে গিয়ে উঠলেন 'স্বাগত'-য়। তাঁর পিছন পিছন চলল সকলেই।

'স্বাগত'-য় রাজেশের কেবিনের দরজা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন সোমেশ্বরদা। তার পিছন পিছন সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গে দু-চারজন পাইলট আর মাল্লাও আছে। চাপা অস্ফুট গলায় কথা বলছিল বুড়ো আলি। আজ ভোরের আগে তারা কেউ জানতেই পারে নি যে পিঙ্কি এই লঞ্চে আছে। কারণ খামোখা সাহেবদের কেবিন খুলতেই বা যাবে কেন তারা।

সিরাজুল বলল, 'স্বাগত' ছাড়বার আগে পিঙ্কি মেমসাহেবকে সে 'স্বাগত'য় যেতে দেখেছিল। তারপর সে অন্য কাজে চলে যায়। সে ভাবেই নি যে মেমসাহেব ওই লঞ্চেই থেকে গেছেন।

রাজেশের বিছানাতেই ঘুমিয়ে ছিল পিঙ্কি। পরণে রুপোলী তারা ছড়ানো শাদা ফ্ল্যানেলের মতো পোশাক। তার মুখের চারপাশে গুচ্ছ গুচ্ছ খোলা চুল সাজানো। বড় শান্তিতে আরামে ঘুমিয়ে গেছে সে। মেঝেয় পাতা বাসন্তী রঙের কার্পেটের রোমশ গায়ে আটকে আছে সেই সরু লম্বা চেনা শিশিটা।

কখন পিঙ্কি শিশিটা নিয়েছিল?

রানী ভাবতে লাগল তারপর তার মনে পড়ল ওই ঘরেই তো প্রায় পিঙ্কির মাথার কাছেই ঝুলছিল সোমেশ্বরদার পাঞ্জাবীটা। পিঙ্কি অসুস্থ হয়ে ওই ঘরে অনেকক্ষণ একা শুয়ে ছিল।

তারপর সবাই যখন শিকারের তোড়জোড় করছে সবার অলক্ষ্যে পিঙ্কি 'প্লীজ ডু নট ডিস্টার্ব' কার্ড লাগানো কেবিন থেকে চলে গিয়েছিল 'স্বাগত'য়। সে জানত 'স্বাগত'য় কোন কার্ড লাগানো না থাকলেও তাকে কেউ 'ডিস্টার্ব' করতে আসবে না।

একা একা সাগরের মাঝখানে, লঞ্চের কেবিনে ঝড়ে সাইক্লোনে কি অদ্ভুত নির্বাচিত ইচ্ছা-মরণ রাজেশ ভিড় থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে পিঙ্কির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর তার বালিশের পাশে রাখা ভাঁজ করা কাগজটি তুলে নিল সন্তর্পণে।

পিঙ্কি ভালো বাংলা লিখতে পারত না। তাই সে টানা টানা ছাঁদে ইংরেজীতে তার মনের কথা লিখে রেখে গেছে—

> সে চলে গেছে। সে বেঁচে গেছে। রোগ আর তাকে কষ্ট দিতে পারবে না। আমি চলে গেলাম। আমি বেঁচে গেলাম। পৃথিবীর কোন দুঃখ আর আমায় বিঁধতে পারবে না।
>
> —পিঙ্কি—